Islami Ain O Bichar | ISSN:1813-0372, E-ISSN:2518-9530
Vol. 21, Issue: 82-83 | submission: 2025-09-30
April-June & July-Sept. 2025 | Published : 2025-11-20
DOI: 10.58666/iab.v21i82-83.319

The Concept and Application of Maẓālim Courts (Ombudsman) in Muslim Administration of Justice

A Historical Inquiry

Boorhan Al Mahmud*

Abstract

In Islamic history, the independent judicial structure that emerged at various stages of the long Muslim rule, traversing beyond the limits of the conventional judicial process, in order to protect the common people from the wrongdoings of state officials and influential groups, is known as the 'Maẓālim Court'. Although scattered forms of the Maẓālim Court are found in various forms from the Prophetic era to the Umayyad era, researchers generally agree that the full institutional development of the Maẓālim Court took place during the Abbasid era. In particular, the theoretical basis of the Maẓālim Court is presented in a comprehensive manner in the renowned book "al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah" authored by Imam al-Māwardī (d. 1058 AD), where he describes its nature, boundaries, and procedures in detail. Authors and researchers of latter period have mainly relied on the aforementioned work of al-Māwardī. Modern Western researchers have also paid special attention to the Maẓālim Court in order to comprehend the nature and process of the judicial system of Muslim rulers. Their writings and research have yielded a lot of valuable information and thoughtful analysis. However, due to the differences in the epistemological framework, their conclusions have often differed from the views of Muslim scholars. Keeping this in mind, the present article presents the practical details of the Maẓālim Court in the light of history. The article demonstrates that the Maẓālim Court is not only a symbol of state order and political authority, but also a crucial manifestation of the Islamic concept of justice. It was an institution that played an effective role in protecting the rights of the common people, ensuring the accountability of those in power, and strengthening social justice. In addition, this judicial structure is not only a matter of historical curiosity but is also very relevant in the discussion of contemporary justice and administrative accountability.

* Boorhan Al Mahmud, Research Officer, Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre, Purana Paltan, Dhaka. Email: almahmud260@gmail.com

Keywords: Maẓālim Court, Justice, Caliph, Ombudsman, Dār al-‘Adl

মুসলিম বিচারশাসনে মাজালিম আদালতের (ন্যায়পাল) ধারণা ও প্রয়োগ একটি ঐতিহাসিক অনুসন্ধান

সারসংক্ষেপ

সুদীর্ঘ মুসলিম শাসনামলের বিভিন্ন পর্যায়ে রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা ও প্রভাবশালী গোষ্ঠীর অন্যায় আচরণ থেকে সাধারণ জনগণকে রক্ষার তাগিদে প্রচলিত বিচারপ্রক্রিয়ার সীমা অতিক্রম করে যে স্বতন্ত্র বিচার কাঠামোর উদ্ভব ঘটেছিল, ইসলামী ইতিহাসে তা 'মাজালিম আদালত' নামে পরিচিত। নববি যুগ থেকে শুরু করে উমাইয়া যুগ পর্যন্ত মাজালিম আদালতের বিক্ষিপ্ত রূপ পাওয়া গেলেও গবেষকগণ সাধারণভাবে এ বিষয়ে একমত যে, মাজালিম আদালতের পূর্ণাঙ্গ প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ ঘটে আব্বাসিয় শাসনামলে। বিশেষত মাজালিম আদালতের তাত্ত্বিক ভিত্তি সুসংহতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে ইমাম আল-মাওয়ার্দি রহ. (মৃ. ১০৫৮ খ্রি.) রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-আহকাম আল-সুলত্বানিয়্যাহ'-তে, যেখানে তিনি এর প্রকৃতি, সীমারেখা ও কার্যপ্রণালী বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। পরবর্তী সময়ের লেখক ও গবেষকগণ মূলত আল-মাওয়ার্দির উক্ত রচনার উপরই নির্ভর করেছেন। মুসলিম শাসকদের বিচারব্যবস্থার ধরন ও প্রক্রিয়া অনুধাবনের জন্য আধুনিক পশ্চিমা গবেষকগণও মাজালিম আদালত বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছেন। তাঁদের রচনা ও গবেষণায় বহু মূল্যবান তথ্য ও চিন্তাশীল বিশ্লেষণ উঠে এসেছে। তবে জ্ঞানতাত্ত্বিক কাঠামোর পার্থক্যের কারণে তাঁদের উপসংহার অনেক সময় মুসলিম আলেমদের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে ভিন্নতর হয়েছে। এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে মাজালিম আদালতের প্রায়োগিক বিবরণ ইতিহাসের আলোকে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে যে, মাজালিম আদালত কেবল রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা ও রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রতীক নয়, বরং ইসলামের ন্যায়বিচার ধারণার একটি গুরুত্বপূর্ণ বহিঃপ্রকাশ। এটি ছিল এমন এক প্রতিষ্ঠান, যা সাধারণ মানুষের অধিকার সংরক্ষণ, ক্ষমতাসীনদের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং সামাজিক ন্যায়বোধ সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। পাশাপাশি এই বিচার কাঠামো কেবল ঐতিহাসিক কৌতূহলের বিষয় নয়, বরং সমসাময়িক ন্যায়বিচার ও প্রশাসনিক জবাবদিহিতা সম্পর্কিত আলোচনায় তা খুবই প্রাসঙ্গিক।

মূলশব্দ : মাজালিম আদালত, ন্যায়বিচার, খলিফা, ন্যায়পাল, দারুল আদল

ভূমিকা

আল্লাহ তাআলা মানুষকে 'ফিতরাত' তথা সত্য ও ন্যায়ের প্রতি স্বভাবজাত আকর্ষণ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় দেখা যায় যে, মানবজাতি সামষ্টিকভাবে মিথ্যা ও জুলুমকে ঘৃণা করে। পাশাপাশি মানব চরিত্রের এক অমোঘ বাস্তবতা হল,

মানুষের মধ্যে কিছু ব্যক্তি যখন ক্ষমতাবান হয়ে ওঠে, তখন তার মধ্যে অন্যকে পদানত করার মনোভাব মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এভাবেই জুলুমের পটভূমি তৈরি হয়।

আল্লাহপ্রদত্ত ফিতরাতের ফলে কোনো সভ্য সমাজ জুলুমকে স্থায়ীভাবে মেনে নেয় না। বরং প্রত্যেক সমাজ তার পারিপার্শ্বিকতার আলোকে জুলুমকে প্রতিহত করার জন্য নিজস্ব অভ্যন্তরীণ কাঠামো বা প্রক্রিয়া (mechanism) গড়ে তোলে। জুলুম প্রতিহত করা এবং দুর্বলকে সহায়তার করার এমনই এক রাষ্ট্রীয় প্রক্রিয়া হল ন্যায়পাল পদ্ধতি। ইসলামের ঐতিহ্যগত শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ থেকে একে 'মাজালিম আদালত' বলা হয়।

মূলত সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই মাজালিম আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর অধিপতি বা বিচারক সাধারণ বিচারকের তুলনায় অধিক মর্যাদাসম্পন্ন ও ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে থাকেন। রাষ্ট্রীয় প্রভাবশালী ও ক্ষমতাবানরা জনসাধারণের উপর যে অন্যায় বা জুলুম করে, মাজালিম আদালত সেগুলোর বিচার করে থাকে। কালক্রমে মাজালিম আদালত ইসলামী রাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিচারপ্রতিষ্ঠান হিসেবে আবির্ভূত হয়।

আলোচ্য প্রবন্ধের প্রথম অংশে মাজালিম আদালত ও আধুনিক ওম্বুডসম্যান (ombudsman) তথা ন্যায়পাল নিয়ে সমসাময়িক স্কলারদের রচিত একাডেমিক রচনার সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হয়েছে। সকল গ্রন্থ-প্রবন্ধের পর্যালোচনা উল্লেখ করা না হলেও আশা করা যায় যে, পাঠক মাজালিম আদালতের আধুনিক ডিসকোর্স সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাবেন। এরপরে প্রাচীন যুগের ন্যায়পাল-এর ধারণা, মাজালিম আদালতের পরিচয়, ইসলামের দৃষ্টিতে ন্যায়বিচার এবং মাজালিম ব্যবস্থার নৈতিক-ধর্মীয় ভিত্তি তুলে ধরা হয়েছে।

প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশে ধারাবাহিকভাবে মাজালিম আদালতের প্রাতিষ্ঠানিক সূচনা এবং এর প্রাতিষ্ঠানিক বিস্তার সম্পর্কে ধারাবাহিক আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। সেই সাথে গুরুত্ব বিবেচনায় ইমাম আল-মাওয়ার্দি ও কাযি আবু ইয়ালা আল-ফাররা রহ. রচিত 'আল-আহকাম আল-সুলত্বানিয়্যাহ' গ্রন্থে উপস্থাপিত মাজালিম আদালত সংক্রান্ত আলোচনার সারমর্ম তুলে ধরা হয়েছে। একই সঙ্গে মিসরসহ বিভিন্ন অঞ্চলে মাজালিম আদালতের গঠন, কার্যপদ্ধতি ও বাস্তব প্রয়োগ বিশ্লেষণের মাধ্যমে এর তাত্ত্বিক কাঠামো ও ঐতিহাসিক বিকাশকে সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

শেষ দিকে মাজালিম আদালতের কিছু পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে যেখানে পশ্চিমা গবেষকদের সমসাময়িক সমালোচনা, মূল্যায়ন ও জ্ঞানতাত্ত্বিক ভিন্নতা সংক্ষেপে উঠে এসেছে। এরপর ন্যায়পালের প্রয়োজনীয়তা ও বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরা হয়েছে। প্রবন্ধের শেষ অংশে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মাজালিম আদালত বা ন্যায়পাল জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করতে হলে কোন কোন বিষয়ে মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন–তা উল্লেখ করা হয়েছে। আশা করা যায়, প্রবন্ধটি ইসলামী ইতিহাসের

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিচারিক প্রতিষ্ঠানকে গভীরভাবে অনুধাবনের একটি প্রেক্ষাপট প্রদান করবে এবং মাজালিম আদালতের অভিজ্ঞতা থেকে আধুনিক ন্যায়বিচার কাঠামোর জন্য সম্ভাব্য অনুপ্রেরণা ও কার্যকর নীতি নির্ধারণে সহায়তা করবে।

আধুনিক সাহিত্য পর্যালোচনা

ড. জিয়াউল্লাহ রাহমানি রচিত Wilāyat al Maẓālim : Application of Siāsah Sharia'h Meaning of *Wilāyat al Maẓālim* – শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, ইসলামী আইনি ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হল ন্যায়বিচার, যা প্রথাগত ও অপ্রথাগত বিভিন্ন পদ্ধতির সমন্বয়ে এই লক্ষ্য অর্জনের প্রয়াস চালায়। এই ব্যবস্থার মধ্যে 'মাজালিম ব্যবস্থাপনা' (*Wilāyat al Mazālim)* একটি বিশেষ সরকারি বিভাগ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ, যা সাধারণ আদালতের চেয়ে বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন। গবেষণাটি মূলত এই প্রতিষ্ঠানের ধারণা, উদ্দেশ্য, পদ্ধতি ও কার্যপরিধি ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছে যে, এটি ইসলামী শাসনব্যবস্থার একটি বিশেষ বিভাগ, যা প্রশাসনিক অন্যায়, ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতি প্রতিরোধে ভূমিকা রাখে। প্রবন্ধে মাজালিমের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার যোগ্যতা, এখতিয়ার এবং অন্যান্য অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের (যেমন: হিসবাহ) সঙ্গে এর পার্থক্য সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। এই প্রবন্ধে এই বিভাগের ধারণা, পরিসর, পদ্ধতি, যোগ্যতা ও এখতিয়ার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রে লেখক ইমাম আল-মাওয়ার্দি রহ.-এর লেখনির উপর নির্ভর করেছেন। প্রবন্ধের শেষে লেখক এই উপসংহারে আসেন যে, শরিয়ত যেহেতু জুলুমকে হারাম করেছে এবং সমাজ থেকে জুলুম প্রতিরোধ করা আবশ্যক, সেহেতু মাজালিম ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করা জাতির জন্য সামষ্টিক দায়িত্ব (communal obligation) হিসেবে বিবেচিত হবে।[১]

মধ্যযুগীয় মুসলিম শাসনব্যবস্থার বিচার ও প্রশাসনিক কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে মাজালিম আদালতের প্রতি গবেষকদের আগ্রহ দীর্ঘদিন ধরে পরিলক্ষিত হয়েছে। ম্যাথিউ টিলিয়ার (Mathieu Tillier) রচিত *The Mazalim in Historiography* প্রবন্ধে এই ধারণাটির বহুমাত্রিকতা বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। তিনি দেখান, মাজালিম শব্দটি আরবি 'জুল্ম' (অন্যায়) মূল থেকে উদ্ভূত, এবং এটি এমন একটি বিচারিক ব্যবস্থা যাতে প্রচলিত আদালতের আওতার বাইরে থেকে শাসক নিজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় হস্তক্ষেপ করতেন। ইমাম আল-মাওয়ার্দির 'আল-আহকাম আল-সুলত্বানিয়্যাহ' গ্রন্থে এই প্রতিষ্ঠানটির স্বতন্ত্র কাঠামো ও কার্যক্রম ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যেখানে এটি প্রচলিত কাযির আওতাভুক্ত নয় এমন অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য শাসকের বিশেষ এখতিয়ার হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। টিলিয়ার তাঁর প্রবন্ধে বলেন, মাজালিম বিষয়ে প্রথমদিকের গবেষকদের মধ্যে অ্যামেড্রোজ (Amédroz) ও এমিল টিয়ান (Émile Tyan) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

[1]. Dr. Ziaullah Rahmani, "Wilāyat al Maẓālim: Application of Siāsah Sharia'h Meaning of Wilāyat al Maẓālim," *Al-Idah* 25, no. 2 (2012): 1–22.

অ্যামেড্রোজ এই প্রতিষ্ঠানটিকে এমন এক ব্যবস্থারূপে বর্ণনা করেন, যেখানে শাসকের ভয়ভীতি ও ক্ষমতার মাধ্যমে ন্যায়বিচার আরোপ করা হতো। অপরদিকে, টিয়ান এটিকে একটি ব্যতিক্রমধর্মী আদালত হিসেবে চিহ্নিত করেন, যা মূলত প্রভাবশালী ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের বিচার প্রক্রিয়ায় সক্রিয় থাকত। যদিও তাঁদের ব্যাখ্যার দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্য রয়েছে, তথাপি উভয়েই মাজালিম আদালতের নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারণের সমস্যার কথা স্বীকার করেছেন। বিশেষত এর স্থান-কালের ভিন্নতা এবং আধুনিককালে এর কোনো হুবহু সমতুল্য কোনো প্রতিষ্ঠান না থাকার কারণে বিষয়টি জটিল হয়ে পড়েছে। ফলে অনেক গবেষক একে একটি *sui generis* বা 'স্বতন্ত্র' প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করেছেন, যা বিচারিক ও নির্বাহী ক্ষমতার সংযোগস্থলে অবস্থান করত।

তিনি আরো উল্লেখ করেন, আধুনিক গবেষণার ধারা মূলত অভিজ্ঞতাভিত্তিক ও প্রামাণ্য তথ্যনির্ভর বিশ্লেষণের দিকে অগ্রসর হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, স্যামুয়েল স্টার্ন (Samuel Stern)-এর পিটিশনভিত্তিক গবেষণা মাজালিম আদালতের বাস্তবিক প্রয়োগ ও সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে এর সম্পর্ক অনুধাবনে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। তিনি দেখান যে, ফাতেমীয়, আইয়ুবীয় ও মামলুক শাসনামলে মাজালিম আদালতের কার্যক্রম ছিল অনেকটা প্রশাসনিক ধরনের। এসব গবেষণা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মাজালিম আদালত বিচার ব্যবস্থার অংশ হওয়ার পাশাপাশি রাজনৈতিক ক্ষমতা ও সামাজিক কর্তৃত্বের প্রতীক হিসেবেও বিবেচিত হতো।

তদুপরি, মাজালিম আদালত ও সিয়াসাহ ধারণার মধ্যকার সম্পর্ক নিয়েও গবেষণায় নতুন নতুন বিশ্লেষণ যুক্ত হয়েছে। যদিও প্রাচীন উৎসগুলোতে এ দুটি প্রায়শই সমার্থকরূপে ব্যবহৃত হয়েছে, এমিল টিয়ান (Émile Tyan)-এর মতো গবেষকরা শব্দদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের চেষ্টা করেছেন– যেখানে 'সিয়াসাহ' বোঝায় সাধারণ শাসনক্ষমতা এবং মাজালিম আদালত বোঝায় শাসকের সরাসরি বিচারিক হস্তক্ষেপ। এই পার্থক্য মাজালিম আদালতের বহুমাত্রিক চরিত্রকে স্পষ্ট করে তোলে, যা একই সঙ্গে বিচারিক, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কার্যাবলি সম্পাদন করত।

উক্ত প্রবন্ধের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হলো, মাজালিম আদালত ধর্মীয় আইনের (শরিয়া) আওতাধীন ছিল কিনা। কেউ বলেন, যেহেতু মাজালিম আদালতে শরিয়া সংক্রান্ত অভিযোগ করা হতো না, তাই এটি ধর্মীয় বিচারব্যবস্থা থেকে আলাদা ছিল। অন্যরা মনে করেন, তৎকালীন প্রেক্ষাপট বিবেচনায় ধর্মীয় ও সাধারণ বিচারব্যবস্থার মধ্যে এরকম বিভাজনের অবকাশ ছিল না। কারণ বিচারকগণ প্রথাগত আইন যেমন জানতেন, রাজনৈতিক শাসকেরাও তেমনি শরিয়ার আইনকে গ্রাহ্য করতেন।

ম্যাথিউ টিলিয়ার তাঁর প্রবন্ধে এই বিষয়টিও এসেছেন– মাজালিম কি এক ধরনের আপিল আদালত ছিল? যদিও আল-মাওয়ার্দি তা বলেননি, তথাপি যারা সরকারি অন্যায়ের শিকার হতেন, তাদের জন্য এটি ছিল চূড়ান্ত আশ্রয়স্থল। তবে অনেক

ঐতিহাসিক মনে করেন, এটি ছিল শাসকের ন্যায়বিচার নিয়ন্ত্রণের একটি পদ্ধতি, শরিয়ার প্রচলিত কাঠামোর বাইরে।[২]

মুস্তাফা ইয়াহইয়া মুস্তাফার রচিত ولاية المظالم: دراسة مقارنة গ্রন্থটি মূলত একটি মাস্টার্স থিসিস। উক্ত থিসিসে গবেষক মাজালিম নিয়ে তুলনামূলক ও বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। গবেষক শুরুতে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের আলোকে মাজালিম আদালতের 'স্বাতন্ত্র্য' ও ঐতিহাসিক শিকড় বিশ্লেষণ করেছেন। এখানে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, এ প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র তাত্ত্বিক কাঠামো নয়, বরং প্রারম্ভিক ইসলামী যুগ থেকেই এর কার্যকর ভূমিকা ছিল এবং খিলাফত ও সালতানাত উভয় পর্যায়ে এটি রাষ্ট্রীয় বিচারব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে বিকশিত হয়েছে। এছাড়া লেখক বিচারকের যোগ্যতা, বিচার প্রক্রিয়ার সরলতা, সাধারণ নাগরিকের নিকট পৌঁছনোর সুযোগ এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সঙ্গে এর সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা প্রদান করেছেন।

থিসিসটিতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আলাচনা হলো: কাযা (সাধারণ বিচারব্যবস্থা) ও হিসবাহ (তদারকি বিভাগ)– এই দুই ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মাজালিমের সীমারেখা নির্ধারণ। লেখক তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন যে, কোন ক্ষেত্রে মাজালিম আদালত হস্তক্ষেপ করে এবং কোন ক্ষেত্রগুলো অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের আওতায় পড়ে। এভাবে তিনি মাজালিমের এখতিয়ার ও কার্যাবলির সুনির্দিষ্ট রূপরেখা এঁকেছেন।

গবেষণার শেষে তিনি মাজালিমের দায়িত্ব, এখতিয়ার ও কার্যপরিধি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন। এছাড়া, গবেষণায় সৌদি আরবের 'দিওয়ান আল-মাজালিম' এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় যেমন–ঘুষ সংক্রান্ত বিচার, অন্যায়ভাবে প্রদত্ত রায় এবং জালিয়াতি সংক্রান্ত মামলার উদাহরণও আলোচিত হয়েছে।

সার্বিকভাবে, মুস্তাফা ইয়াহইয়া মুস্তাফার এই গ্রন্থ মাজালিম আদালতের ইতিহাস, কাঠামো ও কার্যাবলি বোঝার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ একাডেমিক উৎস হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ, তুলনামূলক পর্যালোচনা এবং সমকালীন প্রয়োগের সমন্বয় গ্রন্থটিকে গবেষকদের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী করেছে।[৩]

ড. হামদি আব্দুল মুনইম ديوان المظالم نشأته وتطوره وإختصاصاته مقارنا بالنظم القضائية الحديثة গ্রন্থে লেখক ঐতিহাসিক, ফিকহি ও তুলনামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে দিওয়ান আল-মাজালিমের উৎপত্তি, বিকাশ, কাঠামো ও বিচারিক কার্যাবলি বিশ্লেষণ

[২]. Mathieu Tillier, "The Mazalim in Historiography," in *The Oxford Handbook of Islamic Law*, ed. Anver M. Emon and Rumee Ahmed (Oxford: Oxford University Press, 2018), 357-80.

[৩]. Muṣṭafā Yaḥyā Muṣṭafā. *Wilāyat al-Maẓālim: Dirāsah Muqāranah*. Master's thesis, Jāmi'at al-Imām Muḥammad ibn Su'ūd al-Islāmiyyah, Riyadh, Saudi Arabia, supervised by Dr. 'Abd al-Fattāḥ Muṣṭafā al-Ṣayfī, n.d.

করেছেন। প্রথমে তিনি "ولاية" তথা শাসন ও বিচারিক দায়িত্বের মৌলিক ধারণা ব্যাখ্যা করেন এবং অত্যাচার দমন বা মাজলুমের অধিকার প্রতিষ্ঠার ইসলামী নীতির ঐতিহাসিক ও শরঈ উৎস তুলে ধরেন। এরপর প্রাথমিক ইসলামী যুগে –বিশেষত আল্লাহর রাসূল ﷺ এর যুগ থেকে শুরু করে খিলাফতে রাশেদা, উমাইয়া এবং আব্বাসীয় আমল পর্যন্ত– দিওয়ান আল-মাজালিমের বিকাশের ধাপসমূহ বর্ণনা করেন। লেখক এখানে শুধু প্রতিষ্ঠানের বিবর্তন নয়, বরং রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটেও এর কার্যক্রমের বিশ্লেষণ করেছেন।

উক্ত গ্রন্থে মাজালিম আদালতের গঠনপ্রক্রিয়া, বিচারকদের যোগ্যতা, এখতিয়ার ও কার্যপ্রণালি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তিনি মিসর ও আন্দালুসে মাজালিম আদালতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োগ পদ্ধতির পৃথক আলোচনা করেছেন, যা আঞ্চলিক ভিন্নতা ও ঐতিহাসিক পরিস্থিতির সাথে প্রতিষ্ঠানের অভিযোজনকে স্পষ্ট করে।

উল্লেখযোগ্যভাবে, লেখক দিওয়ান আল-মাজালিম ও অন্যান্য সমসাময়িক বিচারিক কাঠামোর মধ্যে তুলনা করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে মাজালিম আদালত শুধু শরিয়া-ভিত্তিক বিচারব্যবস্থার অংশ নয়, বরং প্রশাসনিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্যও একটি কার্যকর প্রতিষ্ঠান ছিল। দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখক আধুনিক বিচারব্যবস্থা ও ইউরোপিয় আইনি কাঠামোর সাথে দিওয়ান আল-মাজালিমের তুলনামূলক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন। এখানে তিনি বিচারিক এখতিয়ার, প্রক্রিয়া, বিচারকদের স্বাধীনতা, প্রশাসনিক আদালতের ভূমিকা এবং মানবাধিকার সুরক্ষার দিক থেকে উভয় ব্যবস্থার মিল ও অমিল চিহ্নিত করেছেন। এই তুলনামূলক পদ্ধতি শুধু ঐতিহাসিক গবেষণাকে সমৃদ্ধ করেনি, বরং আধুনিক প্রশাসনিক বিচারব্যবস্থার তাত্ত্বিক ভিত্তি বোঝার ক্ষেত্রেও সহায়ক হয়েছে। গ্রন্থটি প্রাচীন ও আধুনিক উভয় উৎসের আলোকে প্রমাণনির্ভর বিশ্লেষণ প্রদান করেছে, যা ইসলামী আইন, ইতিহাস এবং তুলনামূলক বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে একটি নির্ভরযোগ্য রেফারেন্স হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ।[4]

ড. জামিলা মাদুর রচিত دور قضاء المظالم في مراقبة أعمال الإدارة في العهد الإسلامي– প্রবন্ধটি ইসলামী শাসনামলে প্রশাসনিক কার্যক্রম তদারকিতে মাজালিম আদালতের ভূমিকার সাথে সম্পর্কিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিশ্লেষণ করেছে। এতে সর্বপ্রথম উক্ত বিভাগের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। মাজালিম আদালতের প্রশাসনিক কার্যকলাপ থেকে সৃষ্ট ভুলক্রটি সংশোধনের একটি কার্যকর মাধ্যম হিসেবে কাজ করত। এছাড়া ব্যক্তিগত অধিকারের সুরক্ষায় এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, কীভাবে এই বিভাগটি নির্বাহী কর্তৃপক্ষের দ্বারা সংঘটিত যে কোনো অনিয়ম বা সীমালঙ্ঘন থেকে ব্যক্তিকে রক্ষা করত এবং প্রশাসনিক আচরণ তদারকির জন্য

[4]. Ḥamdī ‘Abd al-Mun‘im, *Dīwān al-Maẓālim: Nash’atuh wa Taṭawwaruh wa Ikhtiṣāṣuh Muqāranan al-Niẓam al-Qaḍā’iyyah al-Ḥadīthiyyah* (Beirut: Dār al-Shurūq, 1983).

একটি সুস্পষ্ট ও কার্যকর কাঠামো প্রদান করত। এই প্রক্রিয়া ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ছিল। সবশেষে আলোচনায় এসেছে প্রশাসনের ওপর মাজালিম আদালতের ইতিবাচক প্রভাব। আদালতটি প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করত এবং জনসেবায় নিয়োজিত কর্মকর্তাদের আরও আন্তরিক ও দায়বদ্ধভাবে কাজ করতে উৎসাহিত করত। এই সব বিষয় একত্রে প্রবন্ধটি সংক্ষেপে একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরেছে, যেখানে মাজালিম আদালতকে ইসলামী প্রশাসনিক ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এনিকা হাজদারি (Enika Hajdari) রচিত “Ombudsman- Historical Views” প্রবন্ধে ‘ওম্বুডসম্যান’ (বাংলাঃ ন্যায়পাল) নামক প্রতিষ্ঠানটির একটি বিস্তৃত বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে। এতে ‘ওম্বুডসম্যান’ কে নাগরিক ও প্রশাসনের মধ্যকার দূরত্ব দূরীকরণে একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতুবন্ধন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। লেখিকা প্রবন্ধটিতে এই প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসগত উৎস অনুসন্ধান করেছেন, প্রাচীন গ্রিস ও রোমান সাম্রাজ্যের নানা প্রতিষ্ঠানকে আধুনিক ওম্বুডসম্যান ধারার পূর্বসূরি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। স্পার্টার এফরস, রোমান ট্রাইবিউনস প্লেবিস, এবং ডিফেন্সর সিভিটাটিস এর মতো প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে নাগরিক অধিকার রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

আধুনিক ওম্বুডসম্যান প্রতিষ্ঠান প্রথম চালু হয় ১৭১৩ সালে সুইডেনের রাজা চার্লস দ্বাদশ কর্তৃক, যেটি ১৭৬৬ সালে ‘সংসদীয় ওম্বুডসম্যান’ (Högste Ombudsmannen) - এ রূপান্তরিত হয়। এই মডেলটির মাধ্যমে আমলাতন্ত্রের উপর নজরদারি ও বিচারপ্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হয়। পরবর্তীতে সুইডেনের এই মডেল অন্যান্য রাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়ে এবং সংশ্লিষ্ট দেশের সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক প্রেক্ষাপটে অভিযোজিত হয়। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন সাধারণত সাংবিধানিক সংস্থার সঙ্গে সম্পর্ক, আঞ্চলিক কার্যপরিধি, বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা ও সাংগঠনিক কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে করা হয়। আন্তঃরাষ্ট্রীয় পর্যায়ে, ‘মাসট্রিখ্‌ট’ (Maastricht) চুক্তির মাধ্যমে ইউরোপিয় ওম্বুডসম্যান প্রতিষ্ঠা পায়, যা ইউরোপিয় ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রশাসনিক অব্যবস্থাপনার অভিযোগ তদন্ত করে (তবে বিচার বিভাগ ব্যতীত)। ইউরোপিয় পার্লামেন্ট এই পদে নিয়োগ দিয়ে থাকে এবং এর কার্যক্রম নির্ধারণ করে, যদিও ওম্বুডসম্যান একজন স্বাধীন কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করে। এটি নাগরিক অধিকারের সুরক্ষায় একটি নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থারূপে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আঞ্চলিক দৃষ্টিকোণ থেকে, ইতালির অভিজ্ঞতা একটি বিকেন্দ্রীকৃত মডেল উপস্থাপন করে। যদিও সেখানে জাতীয় পর্যায়ে ওম্বুডসম্যান নেই, তবে ১৯৯০-এর দশক থেকে আঞ্চলিক, প্রাদেশিক এবং পৌর পর্যায়ে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছে। এগুলোর লক্ষ্য হলো প্রশাসনের প্রতি নাগরিকদের অধিকার রক্ষা এবং সার্বিক প্রশাসনিক দক্ষতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।

হাজদারির বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ওম্বুডসম্যান প্রতিষ্ঠানের কাঠামো ও কার্যপরিধি বিভিন্ন রাষ্ট্রে ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু এর মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো প্রায় অভিন্ন–যেমন আইনসভার মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করা, স্বাধীনভাবে কাজ করা এবং নিরপেক্ষ তদন্ত পরিচালনা করা। এই প্রতিষ্ঠানসমূহ শুধুমাত্র প্রশাসনিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে না, বরং নাগরিকদের জন্য এক ধরনের মানসিক নিশ্চয়তাও প্রদান করে যে, রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড ন্যায়ের পথে পরিচালিত হচ্ছে।[৫]

বাংলা ভাষায় 'মাজালিম আদালত' নিয়ে স্বতন্ত্র কোনো রচনা আমার দৃষ্টিতে আসেনি। তবে বেশ কিছু গ্রন্থে অন্যান্য বিষয়ের সাথে সম্পূরক আলোচনা হিসেবে মাজালিমের ব্যাপারে আলোকপাত করা হয়েছে। যেমন:

ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত '*ইসলামী বিশ্বকোষ*' এর ১৭তম খণ্ডের ১৫৫-১৫৭ পৃ. পর্যন্ত 'মাজলিম' সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত আলোচনাটি মূলত ১৯৯১ ইং সালে নেদারল্যান্ডের বিখ্যাত 'ব্রিল' (brill) থেকে প্রকাশিত *The Encyclopaedia Of Islam*-এর ৬ষ্ঠ খণ্ডে প্রফেসর নেইলসন কর্তৃক রচিত *Mazālim* ভুক্তির হুবহু অনুবাদ।

এছাড়া ড. আবু বকর মুহাম্মদ জাকারিয়া মজুমদার ও আল আমিন রচিত '*ইসলামে টর্ট আইন*' শীর্ষক গ্রন্থে মাজালিম নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। লেখকদ্বয় অতি সংক্ষেপে বর্ণনামূলক ভঙ্গিতে মাজালিম কোর্টের উৎপত্তি, সূত্রপাত ইত্যাদি থেকে শুরু করে মাজালিম কোর্টের এখতিয়ার সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।[৬] আলোচনার শেষাংশে মাজালিম কোর্টে টর্টের বিচার নমুনা উল্লেখ করেছেন। বক্তব্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে লেখকদ্বয় ক্লাসিক উৎসের উপরই অধিক নির্ভর করেছেন। সমসাময়িক বিশ্লেষণ উক্ত আলোচনায় উপস্থাপন করা হয়নি। মূলত টর্ট আইনের সাথে মাজালিম কোর্টের একটি সম্পর্ক স্থাপন করাই উক্ত আলোচনার উদ্দেশ্য বলে মনে হয়। এ ক্ষেত্রে স্বতন্ত্রভাবে মাজালিম কোর্ট সম্পর্কে কোনো বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করা হয়নি যেহেতু উক্ত গ্রন্থের উদ্দেশ্য সেটি নয়।

আবদুন নূর তাঁর '*লোক প্রশাসন: সংগঠন, প্রক্রিয়া ও অনুচিন্তা*' শীর্ষক গ্রন্থে আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতা সম্পর্কিত আলোচনায় মাজালিমের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। লেখক মুসলিম শাসনামলে জবাবদিহিতার ধরন কেমন ছিল তা উল্লেখ করতে গিয়ে 'হিসবাহ' ও 'দিওয়ানুল মাজালিম' এর ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার প্রয়াস পেয়েছেন। পরবর্তীতে 'ন্যায়পাল' অধ্যায়ে আবারও মাজালিম বিষয়ের অবতারণা করেছেন। দুই পৃষ্ঠার আলোচনায় অতি সংক্ষেপে নবুওয়তি যুগ, খোলাফায়ে রাশেদার সময়কাল, উমাইয়া ও আব্বাসি যুগের কিছু উদাহরণ উল্লেখ

[5]. Enika Hajdari, "Ombudsman – Historical Views," *European Scientific Journal*, Special ed., vol. 1 (February 2014): 515–27.

[6]. Dr. Abu Baker Muhammad Zakaria & Al Amin, *Islame tort Aien* (Dhaka: Islamic Foundation, 2023), 340-347.

করেছেন। বক্তব্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে তিনি সমসাময়িক উৎসের উপরে অধিক নির্ভর করেছেন বলে প্রতীয়মান হয়।[৭]

প্রবন্ধ রচনার উদ্দেশ্য

চব্বিশ-উত্তর পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে ন্যায়পাল নিয়োগের বিষয়ে আলোচনা নতুন মাত্রা লাভ করেছে। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন মহল যেমন আশাবাদ ব্যক্ত করছে, তেমনি অনেকে সতর্ক মনোভাবও প্রকাশ করেছেন।[৮] যদিও 'ন্যায়পাল' ও 'মাজালিম আদালত' ভিন্ন ভাষা ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা দুটি প্রতিষ্ঠান, তথাপি তাদের মৌলিক অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অভিন্ন। উভয়ের লক্ষ্য হলো: রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার প্রতিরোধ, নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ এবং প্রশাসনিক অন্যায়ের প্রতিকার। নাম ও কাঠামোতে ভিন্নতা থাকলেও স্বাধীনতা, নিরপেক্ষতা ও জবাবদিহিতার নিশ্চয়তা প্রদানের মতো মৌলিক বৈশিষ্ট্য প্রায় অভিন্ন।

মানুষ সাধারণত তাদের নিজস্ব সামাজিক ও ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ধারণাকে সহজে গ্রহণ করে। এই প্রবণতা ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা ও স্মৃতির ধারাবাহিকতার ফল। মুসলিম প্রধান দেশ হিসেবে বাংলাদেশের জনগণের মানসে ইসলামী শাসন ও মুসলিম ঐতিহ্যের প্রতি একটি স্বাভাবিক অনুরাগ দৃশ্যমান। এই বাস্তবতাকে সামনে রেখে বর্তমান প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হল, মুসলিম শাসনামলে মাজালিম আদালতের উৎপত্তি, বিকাশ ও কার্যাবলি বিশ্লেষণ করা এবং এর ঐতিহাসিক তাৎপর্য নির্ধারণ করার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঠিক করা। প্রবন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য, বাস্তব উদাহরণ এবং মুসলিম শাসকদের রাষ্ট্রীয় ঐতিহ্যের আলোকে মাজালিম আদালতের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ ও ব্যাখ্যা উপস্থাপন করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। এছাড়া কেবল ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ নয়, বরং মুসলিম ও পাশ্চাত্য গবেষণার মধ্যকার জ্ঞানতাত্ত্বিক (epistemological) পার্থক্যটি দেখানোও প্রবন্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। প্রবন্ধের আরো একটি উদ্দেশ্য হল পাঠককে এ ধারণা দেয়া যে, প্রশাসনিক ন্যায়বিচার ও রাষ্ট্রীয় জবাবদিহিতার প্রশ্নটি মুসলিম শাসনব্যবস্থায় বেশ ভালোভাবেই হাজির ছিল এবং প্রাক-আধুনিক মুসলিম সমাজের কর্তৃত্বশীলগণ শরিয়া ও তৎকালীন বাস্তবতার মিথস্ক্রিয়ায় এর যে

[7]. Abdun Noor, *Lok Proshashon: Shangatan, Procria abong Anuchintha* (Dhaka: Bangladesh Institute of Islamic Thought, 2009), 139-42; 147-8.

[8]. এ ব্যাপারে বাংলাদেশের অন্যতম এক রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, প্রথমে ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠিত হয়ে কার্যকরভাবে কাজ শুরু করুক, তারপর একটি স্থায়ী কাঠামো গড়ে তোলা হোক। এজন্য ন্যায়পাল নিয়োগ নিশ্চিত করা, একটি পূর্ণাঙ্গ সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করা, ন্যায়পাল আইন পুনর্বিন্যাস করে তার ক্ষমতা সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা জরুরি, যাতে ন্যায়পালের সুপারিশ বাস্তবায়ন বাধ্যতামূলক হয়। দলের পক্ষ থেকে আরও বলা হয়, এত বড় তদন্তকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান যদি দৃশ্যমান ফলাফল দিতে ব্যর্থ হয়, তবে সেটি জনগণের কোনো কাজে আসে না। (*Daily Naya Diganta*, "Charti chara anya kono bisay samvidhane antarbhukta karte 'na' BNPr," July 29, 2025, https://dailynayadiganta.com/bangladesh/politics/F7niuoM1LzX9)

সমাধান বের করেছিলেন, তা বর্তমানের আধুনিক রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটেও পুরোপুরি প্রাসঙ্গিক ও অনুসরণীয়।

রচনা পদ্ধতি

প্রবন্ধটি ইতিহাসনির্ভর হওয়ায় এর মূল কাঠামো বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে (descriptive method) রচিত হয়েছে। এ পদ্ধতিতে মাজালিম আদালত সম্পর্কিত বিভিন্ন বর্ণনা প্রাথমিক উৎস থেকে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সরাসরি উদ্ধৃতির পরিবর্তে অধিকাংশ স্থানে মূল বক্তব্যের ভাবানুবাদ করা হয়েছে এবং বর্ণনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ প্রথম বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে পাঠক আলোচ্য বিষয়টি সহজেই মূল উৎসে খুঁজে নিতে পারেন। প্রবন্ধে বর্ণনামূলক পদ্ধতির পাশাপাশি বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতিও (analytical method) অনুসরণ করা হয়েছে।

প্রাচীন যুগে ন্যায়পাল-এর ধারণা

মানুষের অন্তর্নিহিত ন্যায়বোধই হচ্ছে সভ্যতার অন্যতম চালিকা শক্তি, যা সমাজে শৃঙ্খলা, সমতা ও মানবিকতার ভিত্তি স্থাপন করে। ন্যায় ও সত্যের এই আদর্শ বিভিন্ন সভ্যতার ধর্মীয় বিধান, সামাজিক রীতিনীতি ও প্রশাসনিক কাঠামোয় গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছে। একারণেই দেখা যায়, মানবসভ্যতার শুরু থেকেই ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার বহুমুখী প্রচেষ্টা বিদ্যমান ছিল। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের নেতৃত্বে এমন অনেক শাসক ছিলেন, যাঁরা সমাজের নিপীড়িত মানুষের অধিকার রক্ষায় মানবিক ও ন্যায়নিষ্ঠ আচরণের জন্য ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিয়েছেন। প্রাচীন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতায় এ ধরনের উদাহরণ মোটেও কম নয়।

প্রাচীন চীনের কিংবদন্তিতে উল্লেখ আছে, বিখ্যাত জ্ঞানী রাজা ইয়াও (Yao)–নিজ প্রাসাদের নিকটে একটি বৃক্ষ স্থাপন করেছিলেন, যা 'অভিযোগ বৃক্ষ' (Vilification Tree) নামে পরিচিত ছিল। এই গাছে সাধারণ নাগরিকরা রাজকীয় কর্মকর্তাদের বিষয়ে নিজেদের মতামত লিখিতভাবে প্রকাশ করে সেই নোটগুলো বৃক্ষের গায়ে সংযুক্ত করতে পারতেন। এর ফলে জনগণের অভিযোগ বা মতামত সরাসরি শাসকের কাছে পৌঁছানোর এক উন্মুক্ত মাধ্যম সৃষ্টি হয়েছিল।[৯] এছাড়া খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় বা চতুর্থ শতকে রচিত এক চীনা আচারপুস্তকে (Ritual of Chou) বলা হয়েছে যে, যারা অভাবগ্রস্ত ও অসহায়, নিঃসহায় ও একাকী, বৃদ্ধ ও কিশোর–তারা তিন দিন পর্যন্ত ড্রাগনস্টোনের[১০] পাশে অপেক্ষা করত; এরপর রাজা তাঁদের কথা শুনে তাদের প্রতি সংঘটিত অন্যায় সংশোধন করতেন। এছাড়া যাদের কোনো অভিযোগ ছিল, তারা প্রাসাদের সম্মুখের রাজঢোল বা 'অভিযোগের ঢোল' (petitioner's drum) আঘাত করতে পারত এবং রাজা অবিলম্বে তাদের কথা শুনতেন।

[৯]. Edward A. Kracke Jr., "Early Visions of Justice for the Humble in East and West," *Journal of the American Oriental Society* 96, no. 4 (Oct.–Dec. 1976): 492.

[১০]. ড্রাগনস্টোন (dragon stone) বা নাগ-পাথরকে চীনাভাষায় বলা হয় লঙ-শি *(lóng shí)*। চৈনিক সভ্যতায় ড্রাগন আভিজাত্য ও শক্তির প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়। গবেষক এডওয়ার্ড ক্র্যাকি তাঁর প্রবন্ধে একে *lung-stone* (ফুসফুস পাথর) হিসেবে উল্লেখ করেছেন। প্রত্যক্ষদর্শীর বরাতে তিনি এই জাতীয় পাথরগুলোকে 'আট-নয় ফুট লম্বা এবং ঝুলন্ত ফুসফুসের মতো' *(eight or nine feet high and shaped like a hanging lung)* বলে উল্লেখ করেছেন। দেখুন: Kracke Jr., "Early Visions of Justice for the Humble in East and West," 494. [কিন্তু এটাকে 'ফুসফুস পাথর' হিসেবে উল্লেখ কেন করলেন - এ ব্যাপারে স্পষ্ট কোনো তথ্য পাইনি। সম্ভবনা আছে যে, উড়ন্ত আকৃতিতে ড্রাগনকে ফুসফুসের মত দেখায়]

এই ড্রাম বা ঢোলের ব্যাপারটি প্রাচীন কোরিয়ার ইতিহাসেও উল্লেখ রয়েছে। সিনমুন-গো (Sinmun'go) ছিল এমন একটি ঢোল, যা ২৬৯ খ্রিষ্টাব্দে নাগরিকদের জন্য চালু হয় এবং পরবর্তীতে রাজা তেজং-এর শাসনামলে (জোসন রাজবংশে) পুনরায় ব্যবহৃত হয়। রাজপ্রাসাদের পাশে রাখা এই ঢোল বাজিয়ে নাগরিকরা অন্যায়ের প্রতিবাদ বা ন্যায়বিচারের আবেদন জানাতে পারত।[১১]

অন্যদিকে প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যে জনগণের অভিযোগ নিষ্পত্তির বিষয়টি অনেকটাই সুগঠিত ও স্তরভিত্তিক বিন্যাসে কাঠামোবদ্ধ ছিল। একেক স্তরের দায়িত্ব ছিল একেক রকম। যেমন:

- **স্পার্টার এফরস (ephors of Sparta)**

এটি ছিল পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিষদ, যারা রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার ওপর নজরদারি চালাত এবং রাজশক্তিকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারত। তারা কর আরোপ, গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি, যুদ্ধ পরিচালনা এবং রাজাকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখত।

- **ট্রাইবিউনস প্লেবিস (tribunes plebis)**

এটি ছিল রোমের জনগণের (বিশেষত নিম্নশ্রেণির) পক্ষে উচ্চশ্রেণির বিরুদ্ধে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার একটি মাধ্যম, যাদের ভেটো দেয়ার ক্ষমতা (intercessio) এবং বিধান কার্যকর করার ক্ষমতা (coercitio) ছিল। প্রাচীন রোমে এই কর্মকর্তারা সাধারণ জনগণের (প্লেবিয়ান) স্বার্থ রক্ষা করতেন এবং অভিজাত শ্রেণি (প্যাট্রিশিয়ান)-এর বিরুদ্ধে জনগণের পক্ষে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা রাখতেন।

- **ডিফেন্সর সিভিটাটিস (defensor civitatis)**

প্রাচীন রোমের আরো একটি পদ, যার দায়িত্ব ছিল জনগণের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা করা এবং সরকারি কর্মকর্তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার থেকে জনগণকে রক্ষা করা। এটি বিশেষ করে সাধারণ শ্রেণির অধিবাসীদের রক্ষায় নিয়োজিত হয়, যার কার্যপরিধি ছিল বাজার নিয়ন্ত্রণ, মূল্য নির্ধারণ ও কর সংগ্রহ তদারকির মতো প্রশাসনিক কার্যাবলি। এই ঐতিহাসিক চরিত্রগুলোর সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল–সরকারি প্রশাসনের অতিরিক্ত ক্ষমতা থেকে নাগরিকদের রক্ষা করা। আধুনিক ওম্বুডসম্যান তথা

[১১]. Han Woo-Keun, *The History Of Korea*, Trans. Lee Kyung-Shik (Honolulu: East-West Center Press, 1970), 237.

ন্যায়পালের মতোই এদের ভূমিকা ছিল নাগরিক অধিকার রক্ষা এবং নাগরিক ও রাষ্ট্রের মধ্যে মধ্যস্থতা করা।[১২]

ইসলামপূর্ব মক্কায় সংঘটিত জুলুম-নিপীড়ন প্রতিরোধে কুরাইশ গোত্রের নেতৃবৃন্দ ইবনু জুদআনের ঘরে 'হিলফুল ফুযুল' (حلف الفضول) নামে একটি চুক্তি সম্পাদন করেন, যা জাহেলি সমাজে 'মাজালিম'-এর অস্তিত্বের স্পষ্ট প্রমাণ বলে অনেকেই মনে করেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে উক্ত চুক্তিতে অংশগ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে ইসলাম প্রতিষ্ঠার পরও এর ন্যায়ভিত্তিক উদ্দেশ্যকে স্বীকৃতি প্রদান করেন।[১৩] এটি প্রমাণ করে যে, ইসলাম পূর্ববর্তী সমাজের ন্যায়পরায়ণ উদ্যোগসমূহ ইসলামের মৌলিক নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলে তা অনুমোদনযোগ্য।

মাজালিম আদালত কী

মাজালিম (مَظَالِمُ) শব্দটি (একবচনে مَظْلَمة) অন্যায় বা জুলুমমূলক কর্মকে নির্দেশ করে। এটি জুলুম-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং 'আদল'(العدل)-তথা 'ন্যায়বিচার' এর বিপরীতার্থক শব্দ। এটি মূলত এমন কিছু বোঝায়, যা 'নিজ নিজ স্থান বা প্রাপ্য অবস্থানে নেই'। এই শব্দটি কুরআনে সরাসরি উল্লেখ নেই। তবে সহীহ বুখারিতে শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়।[১৪] সেখানে এটি 'জুলুম' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

বস্তুত ইসলামী ঐতিহ্যে আদালাতে মাজালিমের পূর্ণাঙ্গ কাঠামোবদ্ধ আলোচনা প্রথম পাওয়া যায় হিজরি পঞ্চম শতক তথা খ্রিস্ট্রিয় একাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে, যখন ইমাম আল-মাওয়ার্দি (মৃ. ৪৫০ হি.) তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আল-আহকাম আল-সুলত্বানিয়্যাহ' রচনা করেন। আল-মাওয়ার্দি রহ. মাজালিম সম্পর্কে উক্ত গ্রন্থে বলেন,

> هو قود المتظالمين إلى التناصف بالرهبة، وزجر المتنازعين عن التجاحد بالهيبة
>
> জুলুমকারী পক্ষদেরকে ভয় দেখিয়ে ন্যায়বিচারে আনা এবং বিবদমান পক্ষদেরকে পরস্পরের পাওনা বা অধিকার অস্বীকার করা থেকে প্রতাপের মাধ্যমে নিবৃত্ত করাই হলো মাজালিম আদালতের কাজ।[১৫]

আল-মাওয়ার্দির সমসাময়িক হাম্বলি ফকিহ আবু ইয়ালা আল ফার্‌রা (মৃ. ৪৫৮ হি.) তাঁর রাষ্ট্রবিষয়ক গ্রন্থ 'আল-আহকাম আল-সুলত্বানিয়্যাহ'তে 'মাজালিম' প্রসঙ্গ অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর প্রদত্ত সংজ্ঞা এবং আল-মাওয়ার্দির প্রদত্ত সংজ্ঞা

12. Enika Hajdari, "Ombudsman – Historical Views," 516–18.
13. Ḥāfiẓ Aḥmad 'Ajjāj Karmī, *al-Idārah fī 'Aṣr al-Rasūl* (Cairo: Dār al-Salām, 1427 H), 240.
14. Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Ismāʿīl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, ed. Muḥammad Zuhayr ibn Nāṣir al-Nāṣir (Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422H), 8:111, Hadith No. 6535. (فَيُقَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ مَظَالِمُ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا)
15. Abūl Ḥasan 'Alī ibn Muḥammad al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, ed. Aḥmad k al-Baghdādī (Kuwait: Maktabah Dār Ibn Qutaibah, 1989), 102.

হুবহু এক। মিসরিয় ইতিহাসবিদ আল-মাকরিযি (মৃ. ৮৪৫ হি./১৪৪২ খৃ.) তাঁর রচনায় মাজালিম আদালতের সংজ্ঞায় আল-মাওয়ার্দি প্রদত্ত সংজ্ঞার শব্দবিন্যাস প্রায় অপরিবর্তিত রেখে পুনরাবৃত্তি করেছেন।[১৬]

কাযি আবু বকর ইবনুল আরাবি (মৃ. ৫৪৩ হি.) মাজালিম ব্যবস্থাকে এক প্রকার ব্যতিক্রমী প্রশাসনিক ব্যবস্থা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন,

> ولاية المظالم فهي ولاية غريبة أحدثها من تأخر من الولاة، لفساد الولاية وفساد الناس
>
> মাজালিম একটি ব্যতিক্রমধর্মী ব্যবস্থা[১৭], যা পরবর্তীকালের শাসকগণ প্রশাসনিক দুর্বলতা ও জনসাধারণের চারিত্রিক অধঃপতনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রচলন করেন।[১৮]

ইবনুল আরাবির সংজ্ঞা থেকে 'মাজালিম আদালত' কেনো দরকার হয়েছিল- তার হদিস পাওয়া যায়। কিন্তু এর প্রকৃতি সম্পর্কে তেমন কিছু বোঝা যায় না। তবে নবম হিজরি শতকের বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ইবনে খালদুন (মৃ. ৮০৮ হি.)-এর প্রদত্ত সংজ্ঞাটি বেশ স্পষ্ট। তিনি বলেন,

> وهي وظيفة ممتزجة من سطوة السّلطنة ونصفة القضاء وتحتاج إلى علوّ يد وعظيم رهبة تقمع الظّالم من الخصمين وتزجر المتعدّي
>
> এটি এমন একটি দায়িত্ব যা রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ও বিচার বিভাগের ন্যায়পরায়ণতার সমন্বয়ে গঠিত। এতে প্রয়োজন দৃঢ় কর্তৃত্ব ও ভীতি প্রদর্শন, যা বিবদমান পক্ষদ্বয়ের মধ্যে অত্যাচারীকে দমন করে এবং সীমালঙ্ঘনকারীকে নিবৃত্ত করে।[১৯]

ইবনে খালদুন এবং ইমাম আল-মাওয়ার্দি দু'জনই 'মাজালিম আদালত' এর গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা প্রদান করেছেন, তবে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছুটা পার্থক্যও রয়েছে। যেমন: আল-মাওয়ার্দি (এবং তাঁর সমসাময়িক আবু ইয়ালা) মাজালিম আদালতকে মূলত শাসকের ক্ষমতার অপব্যবহার বন্ধ করার জন্য তৈরি একটি 'রাজনৈতিক-প্রশাসনিক' ব্যবস্থা হিসেবে দেখেছেন। তাঁদের বিবরণে জোর দেওয়া হয়েছে দুটি বিষয়ের ওপর :

১. জুলুমকারীকে থামানো;
২. বিরোধী পক্ষকে ভয় দেখিয়ে হলেও ন্যায়বিচারের দিকে ফিরিয়ে আনা।

16. Taqī al-Dīn Abū al-ʿAbbās Aḥmad ibn ʿAlī ibn ʿAbd al-Qādir al-Maqrīzī, *al-Mawāʿiẓ wa'l-Iʿtibār bi-Dhikr al-Khiṭaṭ wa'l-Āthār* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418H), 3:362.
17. শায়খ আব্দুল হাই কাত্তানি উক্ত বক্তব্যের সমালোচনা করেছেন। পরবর্তীতে এর বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করা হবে।
18. Abū Bakr Muḥammad ibn ʿAbd Allāh ibn al-ʿArabī, *Aḥkām al-Qurʾān*, ed. Muḥammad ʿAbd al-Qādir ʿAṭā (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2003), 4:61.
19. Walī al-Dīn 'Abd al-Raḥmān ibn Muḥammad ibn Khaldūn, *Muqaddimah ibn Khaldūn*, ed. 'Abd Allāh Muḥammad al-Darwīsh (Damascus: Dār Ya'rab, 2004), 1:403.

ইবনে খালদুনের যুগে এসে মাজালিম আদালতের ভূমিকা কিছুটা বদলেছিল। তিনি এটিকে শুধু শাসকের অন্যায় ঠেকানোর ব্যবস্থা হিসেবে দেখেননি। বরং তাঁর মতে, মাজালিম হলো এমন একটি দায়িত্ব, যেখানে রাষ্ট্রীয় শক্তি এবং বিচার বিভাগের ন্যায়পরায়ণতা দুটোই একসাথে মিলিত হয়। তাঁর মতে, মাজালিম শুধু দমনমূলক শাসন সংশোধনের প্রতিষ্ঠান নয়; বরং এটি শক্তি ও বিচার উভয়ের সমন্বয়ে গঠিত একটি স্বতন্ত্র বিচারিক কাঠামো, যার কার্যক্ষমতা সাধারণ আদালতের তুলনায় বেশি, বিশেষ করে রায় বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে। সহজ কথায়,

- আল-মাওয়ার্দির কাছে মাজালিম = নিয়ন্ত্রণমূলক প্রশাসনিক ব্যবস্থা
- ইবনে খালদুনের কাছে মাজালিম = বিচার ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সমন্বিত আদালত যেখানে শক্তি (power) ও ন্যায় (justice) সমানভাবে কার্যকর থাকে।

বলা যায় যে, ইবনে খালদুন পূর্ববর্তী সংজ্ঞার সাথে নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। আধুনিক সময়ের প্রখ্যাত ফকিহ ড. ওয়াহবাহ আল-যুহাইলী বলেন,

> ولاية المظالم تشبه إلى حد كبير نظام القضاء الإداري ومجلس الدولة حديثاً، فهي أصلاً للنظر في أعمال الولاة والحكام ورجال الدولة مما قد يعجز عنه القضاء العادي، وقد ينظر واليها في المنازعات التي عجز القضاء عن فصلها، أو في الأحكام التي لا يقتنع الخصوم بعدالتها. ويجتمع فيها القضاء والتنفيذ معاً
>
> মাজালিম বিভাগ আধুনিক প্রশাসনিক বিচারব্যবস্থা এবং 'কাউন্সিল অব স্টেট'-এর সাথে যথেষ্ট সাদৃশ্যপূর্ণ। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল শাসক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের কার্যাবলি পর্যালোচনা করা, যেসব ক্ষেত্রে সাধারণ আদালত প্রায়শই সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হতো। পাশাপাশি, মাজালিম আদালতের অধীনে এমন সব বিরোধ নিষ্পত্তি করা হতো, যা প্রচলিত বিচারব্যবস্থা সমাধান করতে ব্যর্থ ছিল, অথবা যেসব রায়কে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ ন্যায়সংগত বলে মেনে নেয়নি। এ ব্যবস্থার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল–এর মধ্যে বিচারিক ও নির্বাহী ক্ষমতার সম্মিলন ঘটত।[২০]

আধুনিক সময়ের Ombudsman বা ন্যায়পাল এর সাথে 'মাজালিম আদালত' এর বেশ মিল রয়েছে। ইংরেজিতে Ombudsman-কে বাংলায় 'ন্যায়পাল' বা জনস্বার্থ সংবেদশীল মহাপর্যবেক্ষক বলা হয়। সুইডিশ Ombud হতে Ombudsman শব্দের উৎপত্তি, যার অর্থ হচ্ছে একজন ব্যক্তি যিনি অন্যের হয়ে কথা বলেন বা অন্যের প্রতিনিধিত্ব করেন।[২১] বর্তমানে ন্যায়পাল বলতে বোঝায় পার্লামেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত কমিশনার বা কর্মকর্তা। ন্যায়পাল সরকার, মন্ত্রণালয়, সরকারি কোনো প্রতিষ্ঠান বা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ তদন্ত করেন। বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে ন্যায়পাল নিয়োগ করার বিধান রয়েছে। তবে প্রধান ন্যায়পালকে পার্লামেন্ট নিয়োগ

[20]. Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuḥaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Damascus: Dār al-Fikr) 8:6252.

[21]. Abdun Noor, *Lok Proshashon: Shangatan, Procria abong Anuchintha*, 146.

করে। স্বাস্থ্য সেবা কমিশনার বা ন্যায়পাল হতে পারেন, যিনি স্বাস্থ্য বিভাগ সম্পর্কিত অভিযোগ তদন্ত ও রিপোর্ট করবেন। আবার স্থানীয় ন্যায়পাল বা Local Ombudsman হতে পারেন। তিনি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করেন। ন্যায়পাল অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত ও রিপোর্ট করেন কিন্তু বাস্তবায়ন করতে পারেন না।[২২]

তবে বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ন্যায়পালের সাথে 'মাজালিম আদালত' এর বেশ পার্থক্য রয়েছে। কেননা মাজালিম আদালত শুধু অভিযোগ তদন্তই নয় বরং এর যথাযথ সুরহা করত। এর দায়িত্ব শুধু অভিযোগ শ্রবণ ও তদন্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, প্রতিকারের রায় কার্যকর করার ক্ষমতাও এর ছিল। এটি এতই শক্তিশালী ছিল যে, মাজালিম প্রধান ক্ষতিগ্রস্তদের অভিযোগের অপেক্ষা না করেই স্বীয় উদ্যোগে (*Suo moto*) তদন্ত অনুষ্ঠান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারতেন।[২৩]

ইসলামে ন্যায়বিচার ও মাজালিম আদালত

মুসলিম শাসনব্যবস্থায় ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে সকল প্রশাসনিক ও বিচারিক কাঠামো গড়ে ওঠে, তার মধ্যে 'মাজালিম আদালত' ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। সাধারণ বিচারব্যবস্থার আওতায় না আসা বা প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে ন্যায়বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে এই আদালত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

মাজালিম আদালতের অস্তিত্বের পক্ষে সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে নির্দিষ্ট কোনো প্রামাণিক বক্তব্য বা text (نص) নেই। তবে ইসলামী শরিয়তের অন্যতম মৌলিক উদ্দেশ্য হল জুলুম প্রতিরোধ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। আল-কুরআনের বিভিন্নস্থানে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾

নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচার, সদাচার করার আদেশ দেন...[২৪]

আরও একটি আয়াতে আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾

কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদের ন্যায়বিচার থেকে বিরত না রাখে। ন্যায়বিচার করো, এটাই তাকওয়ার নিকটতর।[২৫]

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾

নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিমদেরকে ভালোবাসেন না।[২৬]

[22]. Jalal Firoj, *Parliamentary Shabdakosh* (Dhaka: Bangla Academy, 2016), 167.

[23]. Abdun Noor, *Lok Proshashon: Shangatan, Procria abong Anuchintha*, 140.

[24]. al-Qur'ān, 16:90

[25]. al-Qur'ān, 5:08

[26]. al-Qur'ān, 3:57

উপরিউক্ত আয়াতসমূহ ইসলামী শাসন ও বিচারব্যবস্থার নীতিগত ভিত্তির কথা বলে, যেখানে ন্যায়বিচার এক অপরিহার্য উপাদান। যেহেতু মাজালিম আদালতের লক্ষ্যই ছিল জনসাধারণের মাঝে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা, বিশেষ করে ক্ষমতাবানদের জুলুম থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করা, তাই এর কার্যক্রমকে আল-কুরআনের উপরিউক্ত নির্দেশনার বাস্তব রূপ হিসেবে দেখা যেতে পারে।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا

> আমার বান্দারা! আমি আমার নিজের উপর জুলুমকে হারাম করে নিয়েছি এবং তোমাদের মধ্যেও তা হারাম বলে ঘোষণা করেছি। কাজেই তোমরা একে অপরের উপর জুলুম করো না...।[২৭]

এ বাণীগুলো মূলত ইসলামী আইনি দৃষ্টিকোণে জুলুমের প্রতি ঘৃণা এবং তার প্রতিরোধের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে। মাজালিম আদালতের মূল কাজ ছিল এই 'জুলুম' প্রতিহত করা, বিশেষ করে যখন সাধারণ আদালত রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক চাপে নিরপেক্ষতা হারিয়ে ফেলত।

অতএব, মাজালিম আদালতের ধারণাটি ইসলামের ন্যায়বিচার সম্পর্কিত মৌলিক নীতিসমূহের একটি প্রশাসনিক প্রয়োগরূপ হিসেবে দেখা যেতে পারে। এটা খুবই স্পষ্ট যে, তাত্ত্বিকভাবে মাজালিম আদালতের ভিত্তি ইসলামী মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তবে কাঠামোগত বা সংগঠিতরূপে এই প্রতিষ্ঠানটির কোনো সরাসরি নিদর্শন কুরআন-হাদীসে উল্লিখিত হয়নি। অর্থাৎ, মাজালিম আদালত কুরআনের আদেশানুরূপ হলেও, এটি একটি ইজতিহাদি ও ঐতিহাসিক বাস্তবতা-নির্ভর এমন প্রতিষ্ঠান যা সময়, পরিপ্রেক্ষিত ও প্রশাসনিক প্রয়োজনে উদ্ভূত হয়েছিল।

সহজে এভাবে বলা যায়, ইসলামী শাসনব্যবস্থায় জুলুম প্রতিরোধ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার যে শাশ্বত আহ্বান ও সামগ্রিক চিত্রকল্প রয়েছে, মাজালিম আদালত ছিল তারই একটি উদ্ভাবনী প্রয়োগ। কাঠামোগত ভিন্নতা থাকলেও আদর্শিকভাবে এই আদালত কুরআনের মূলনীতি–'আদল' ও 'ইনসাফ'- বাস্তবায়নে নিয়োজিত ছিল।

মাজালিম আদালতের প্রারম্ভিক যুগ

মুসলিম শাসনব্যবস্থার প্রারম্ভিক যুগে বিচারিক কাঠামো ছিল তুলনামূলকভাবে সরল, নৈতিকতাভিত্তিক এবং জনবান্ধব। প্রাক-ইসলামী আরবে সমাজপতিদের নিকট অবাধে পৌঁছানোর যে রীতি-নীতি বিরাজমান ছিল, ইসলামের প্রাথমিক যুগেও তার নমুনা চোখে পড়ে। এ কারণে দেখা যায়, সাধারণ মানুষ সরাসরি খলিফা বা রাষ্ট্রের শীর্ষ পর্যায়ের শাসকের সঙ্গে যোগাযোগ করে অভিযোগ জানাতে পারত, যা ছিল

[27]. Abū al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim,* ed. Muḥammad Fuwād 'Abd al-Bāqī (Beirut: Dār Iḥyā al-Turāth al-'Arabī, Nd), 4:1994, Hadith No. 2577.

প্রশাসনিক স্বচ্ছতার একটি বড় প্রমাণ। অনেক সময় স্বয়ং রাষ্ট্রপ্রধান নিজেই রাষ্ট্রীয় কর্মচারির কার্যক্রম তদারকি করতেন এবং তাদের কর্মকাণ্ডে কোনো গড়মিল দেখলে নিজেই সেটার প্রতিকার করতেন।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন একাধারে রাষ্ট্রপ্রধান, আইনপ্রণেতা ও বিচারক। এ কারণে হাদীসের গ্রন্থগুলোতে সরাসরি রাষ্ট্রীয় তদারকির বেশ কিছু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন: তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার যাকাত আদায়কারী এক কর্মচারীর আচরণে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন,

ما بال العامل نبعثه، فيأتي فيقول: هذا لك، وهذا لي! فهلا جلس في بيت أبيه وأمه، فينظر أيُهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده، لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيراً له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر.

> কী অবস্থা এ কর্মচারীর! তাকে দায়িত্ব দিয়ে পাঠাই, অথচ সে ফিরে এসে বলে: 'এগুলো আপনার (সরকারি অংশ), আর এগুলো আমার (ব্যক্তিগত উপহার)!' যদি সে সত্যিই হাদিয়া পাওয়ার যোগ্য হতো, তবে বাপ-মার বাড়িতে বসেই তো তা পেত! সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! যে কিছু (অবৈধভাবে) গ্রহণ করবে, কিয়ামতের দিন সে তা নিজের কাঁধে বহন করে উপস্থিত হবে–যদি উট হয় তবে তা ডাকবে, যদি গরু হয় তবে হাম্বা হাম্বা করবে, আর যদি ছাগল হয় তবে তা ভ্যাঁভ্যাঁ করবে।[২৮]

এই হাদীসটি নিয়ে চিন্তাভাবনার অবকাশ আছে। উক্ত কর্মচারী উপহার গ্রহণের মাধ্যমে উপহারদাতাকে কোনো অন্যায় সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিলেন কিনা তা স্পষ্ট নয়। হতে পারে তেমন কিছু ঘটেনি। হতে পারে বিষয়টি নিছক উপহার প্রদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঐশী প্রজ্ঞার মাধ্যমে বুঝতে পেরেছিলেন যে, কোনো সরকারি কর্মচারী দায়িত্ব পালনের সময় গ্রাহকের কাছ থেকে উপহার গ্রহণ করলে তা বিভিন্ন নৈতিক, প্রশাসনিক ও আইনি সমস্যার জন্ম দেয়। এ ধরনের উপহার অনেক সময় সরাসরি ঘুষ না হলেও তা ঘুষের সূক্ষ্ম রূপ হিসেবে পরিগণিত হতে পারে, যা পরবর্তীতে স্বার্থসংঘাতের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। একসময় উপহার গ্রহণকারী ব্যক্তি নিজের দায়িত্ব পালনে ন্যায়পরায়ণতা হারিয়ে ফেলেন এবং ব্যক্তিগত স্বার্থে প্রভাবিত হওয়ার ঝুঁকিতে পড়েন। এতে সরকারি সেবার মান হ্রাস পায় এবং ধীরে ধীরে নানাবিধ জুলুমের পথ খুলে যায়। একারণে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুরুতেই এ ধরনের সকল পথ বন্ধ করে দিয়েছেন।

অন্য এক ঘটনায় দেখা যায়, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রা.-কে বনি জুযাইমা গোত্রের কাছে প্রেরণ করেন। কিন্তু খালিদ ভুলবশত তাদের কিছু লোক বন্দি করে হত্যা করেন। এ ঘটনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে দুইবার বলেন: "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে খালিদের এই কাজ থেকে দায়মুক্তি

[28]. al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 9:70, Hadith No. 7174.

চাচ্ছি”।[২৯] এরপর তিনি আলী রা.-কে ওই গোত্রের ক্ষতিগ্রস্তদের নিকট প্রেরণ করেন এবং তাদের ন্যায্য ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ দেন। আলী রা. ক্ষতিপূরণের অর্থ নিয়ে তাদের কাছে গেলেন এবং ক্ষতিগ্রস্তদের পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করেন।[৩০]

উপরিউক্ত দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায় যে, রাষ্ট্রীয় ন্যায়বিচার কেবল বিচারিক কাঠামোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা প্রতিটি প্রশাসনিক ও সামরিক কার্যক্রমেও প্রসারিত। সেই সাথে রাষ্ট্রের কোনো কর্মকর্তা কর্তব্য পালনের সময় অনিচ্ছাকৃত ভুল করলে রাষ্ট্রকে এর দায় বহন করে ক্ষতিগ্রস্তদের প্রাপ্য পূরণ করতে হবে।

খুলাফায়ে রাশেদার সময়েও এই রীতিনীতি বহাল ছিল। কারণ সে সময়ে খলিফা ও তাঁদের প্রাদেশিক গভর্নরদের সরকারি দায়-দায়িত্ব থেকে বিচারবিভাগীয় দায়িত্ব পৃথক ছিল না। এছাড়া তৎকালীন গভর্নর ও আমলারা অনেক সময় ব্যক্তিগত ন্যায়পরায়ণতা থেকে অথবা খলিফার হস্তক্ষেপের আশঙ্কায় জনগণের সঙ্গে সুবিচার করতেন। যেমন ইতিহাসের গ্রন্থগুলোতে বর্ণিত আছে, দ্বিতীয় খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব রা. তাঁর অধীনস্থ প্রশাসকদের নির্দেশ দিতেন, যেন তারা হজের মৌসুমে একত্র হয়ে তাঁর কাছে হাজির হয়। তারা যখন একত্রিত হতেন, তখন তিনি জনগণের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে বলতেন:

> হে জনগণ! মনে রেখো, আমি আমার কর্মকর্তাদের তোমাদের ওপর এই উদ্দেশ্যে নিয়োগ দেইনি যেন তারা তোমাদের গায়ে হাত তুলবে কিংবা তোমাদের সম্পদ আত্মসাৎ করবে! বরং আমি তাদের দায়িত্ব দিয়েছি, যেন তারা তোমাদের মাঝে সুবিচার কায়েম করে এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ন্যায্যভাবে বণ্টন করে। যদি কেউ দেখে যে তার সঙ্গে অন্যায় আচরণ হয়েছে, তবে সে যেন এখনই দাঁড়িয়ে অভিযোগ করে।[৩১]

ইবনে আসকারী রহ. (মৃ. ৩৯৫ হি.) তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেন, খলিফা আলী রা. মাজালিমের জন্য সর্বপ্রথম স্বতন্ত্র স্থান গ্রহণ করেছিলেন। তিনি একটি ঘর বানিয়েছিলেন যেখানে মানুষ তাদের মাজালিম বিষয়ক নথি (অভিযোগপত্র) জমা দিত বা পেশ করত। পরে কিছু লোক সেখানে তাঁর বিরুদ্ধে অপমানজনক লেখা রেখে দেয়, তখন তিনি সেই ঘর ত্যাগ করেন (বা ব্যবহার বন্ধ করে দেন)।[৩২]

আলী রা. এর মাজালিম আদালতে বসার বিষয়টি ইবনে আসকারীর গ্রন্থ ছাড়াও

29. al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 5:160, Hadith No. 4339. (اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد)
30. Abū al-Faḍl Aḥmad ibn ‘Alī ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fatḥ al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, ed. Muḥammad Fuwād ‘Abd al-Bāqī (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1379H), 8:58.
31. Muḥammad Ibn Sa‘ad, *al-Ṭabaqāt al-Kubrā*, ed. Muḥammad ‘Abd al-Qādir ‘Aṭā (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), 3:223.
32. Abū Hilāl al-Ḥasan ibn ʿAbd Allāh ibn Sahl ibn Saʿīd ibn Yaḥyā ibn Mihrān al-ʿAskarī, *al-Awāʾil*, ed. Muḥammad al-Sayyid al-Wakīl (Ṭanṭā: Dār al-Bashīr, 1408 H), 206. "اتخذ علي بيتا يلقى الناس فيه القصص، حتى كتبوا شتمه فألقوه فيه فتركه"

মাকরিযির বর্ণনাতেও পাওয়া যায়।[৩৩] কিন্তু বিপরীতে ইতিহাসবিদ আল-নুওয়াইরি (মৃ. ৭৩৩ হি.) বর্ণনা করেন, চার খলিফার কোনো একজনকেও মাজালিমের জন্য নিযুক্ত করা হয়নি। বরং বিরোধ বা বিবাদ সাধারণ মানুষের মধ্যে সংঘটিত হলে তা আদালতের রায় দ্বারা সমাধান করা হতো। মরুভূমির কঠোর বা বেয়াড়া লোক সীমা অতিক্রম করলে তাকে উপদেশের মাধ্যমে সতর্ক করা হতো; এরপরও না শুধরালে প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ করা হতো। তবে অধিকাংশ সময় আদালতের রায়ই মান্য করা হতো এবং তা অনুসরণ করা হতো। পরবর্তীতে পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয় এবং জুলুম-নির্যাতন বেড়ে যায়, শুধু নীতিবাক্য দ্বারা এসব প্রতিরোধ করা যেত না। ফলে অত্যাচারীদের নিয়ন্ত্রণ ও নির্যাতিতদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য মাজালিম আদালতের মাধ্যমে বিচারপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল।[৩৪]

আধুনিক সময়ের প্রসিদ্ধ মরোক্কান স্কলার শায়খ আব্দুল হাই আল-কাত্তানি (মৃ. ১৩৮২ হি.) আল-নুওয়াইরির *“চার খলিফার কোনো একজনকেও মাজালিমের জন্য নিযুক্ত করা হয়নি”*–উক্ত বক্তব্য এবং ইবনুল আরাবির মাজালিম আদালতকে “ব্যতিক্রমী ব্যবস্থাপনা (ولاية غريبة)” হিসেবে উল্লেখ করার সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, “তাঁরা (যেমন: ইবনুল আরাবী, নুওয়াইরি ও অন্য ইতিহাসবিদগণ) আল্লাহর নবী ﷺ ও খলিফা উমর রা.-এর সরাসরি বিচারিক কার্যক্রম থেকে প্রাপ্ত ঐতিহাসিক নজিরগুলো উপেক্ষা করেছেন।”[৩৫]

তবে শায়খ কাত্তানির এই সমালোচনাকে একতরফাভাবে মূল্যায়ন করা উচিত হবে না। এটা একদিকে সত্য যে, মাজলুমদের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা ইসলামী শরিয়ার একটি মৌলিক ও কেন্দ্রীয় লক্ষ্য এবং আল্লাহর রাসূল ﷺ ও খুলাফায়ে রাশেদীন এই আদর্শে কোনো আপস করেননি। কিন্তু অপরদিকে এটাও বাস্তবতা যে, তাঁদের যুগে ‘মাজালিম’ নামে কোনো আলাদা ‘প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো’ গঠিত হয়নি। বরং শাসকরা সরাসরি জনগণের অভিযোগ শুনে বিচার করে ন্যায় নিশ্চিত করতেন। এ প্রেক্ষাপটে আল-নুওয়াইরি (এবং ইবনুল-আরাবির) বক্তব্যকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য না করে বরং একটি ঐতিহাসিক বাস্তবতার বিবেচনায় দেখা প্রয়োজন, যেখানে মাজালিম ব্যবস্থা মূলত শাসকদের সরাসরি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ঐতিহ্যের একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ হিসেবে বিকশিত হয়েছে। ফলে উভয় বক্তব্যকেই মুসলিম শাসনামলের বিচারব্যবস্থার বিবর্তন সংক্রান্ত আলোচনায় দুটি ভিন্ন ব্যাখ্যা হিসেবে বিবেচনা করা

33. al-Maqrīzī, *al-Mawāʿiẓ wa’l-Iʿtibār*, 3:362.
34. Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn ʿAbd al-Wahhāb ibn Muḥammad ibn ʿAbd al-Dāʾim al-Nuwairī, *Nihāyat al-Arab fī Funūn al-Adab* (Cairo: Dār al-Kutub wa-l-Wathāʾiq al-Qawmīyah, 1423H.), 6:269. (ولم يكفّهم زواجر المواعظ، فاحتاجوا فى ردع المتغلّبين وإنصاف المظلومين من الظالمين الى النظر فى المظالم)
35. Muḥammad ʿAbd al-Ḥayy ibn ʿAbd al-Kabīr ibn Muḥammad al-Ḥusnī al-Idrīsī al-Kattānī, *al-Tarātīb al-Idārīyah*, ed. ʿAbd Allāh al-Khāldī (Beirūt: Dār al-Arqam, 1963), 1:229.

যেতে পারে। সেই সাথে এটা আমাদেরকে যুগভিত্তিক ঐতিহাসিক বাস্তবতা অনুধাবনের ক্ষেত্রে এই পরিপূরক দৃষ্টিকোণ প্রদান করে যে, ইসলামী শাসন এবং বিচার কাঠামো মূলত ইজতিহাদ লব্ধ এবং যুগের আলোকে তা পরিবর্তন হতে পারে।

মূলত আল্লাহর রাসূল ﷺ এর যুগ থেকে শুরু করে খুলাফায়ে রাশেদার অধিকাংশ সময় পর্যন্ত 'মাজালিম আদালত' নামে কোনো স্বতন্ত্র আদালত বা প্রশাসনিক কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা আসলেই তেমনভাবে অনুভূত হয়নি। এর পেছনে একাধিক সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণ কাজ করেছে। যেমন:

- **খলিফার সহজ নাগাল**

তখনকার সমাজে রাষ্ট্রপ্রধান ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যবধান ছিল অতি সামান্য। একজন সাধারণ নাগরিকও তার ন্যায়বিচারের আবেদন সরাসরি খলিফার নিকট পেশ করতে পারতেন। এই সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থাই প্রশাসনিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করত এবং জটিল আমলাতান্ত্রিক বাধা ছাড়াই ন্যায়বিচার প্রাপ্তিকে সহজ করেছিল।

- **ন্যায়পরায়ণ ও ধর্মপ্রাণ নেতৃত্ব**

সেই সময়কার বিচারক, প্রশাসক এবং শাসকশ্রেণি সাধারণত ধর্মীয় মূল্যবোধে দৃঢ়, সৎ ও ন্যায়বিচারে প্রতিশ্রুতিশীল ছিলেন। খলিফা ও গভর্নরগণ নিজেরাই শরিয়ার নীতি অনুসরণে সচেতন থাকতেন এবং জনকল্যাণকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন। ফলে ক্ষমতার অপব্যবহার বা অনৈতিক হস্তক্ষেপের ঘটনা তুলনামূলকভাবে বিরল ছিল।

- **প্রচলিত বিচারব্যবস্থার প্রতি দৃঢ় আস্থা**

সমাজে প্রচলিত শরিয়াভিত্তিক বিচার কাঠামো ও আদালতের প্রতি জনগণের আস্থা ছিল দৃঢ়। বিচারকাজ দ্রুত, সরল ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন হতো বলে বিকল্প বিচারব্যবস্থা বা বিশেষ ট্রাইব্যুনালের প্রয়োজনীয়তা ছিল না।

তবে ইসলামী রাষ্ট্রের ভৌগোলিক পরিধি ও প্রশাসনিক ব্যাপ্তি যতই বেড়েছে, শাসকদের সাথে জনগণের দূরত্ব ততই বৃদ্ধি পেয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে ক্ষমতার অপব্যবহার, রাজনৈতিক প্রভাব বা বিচারপ্রক্রিয়ায় ধীরগতি দেখা দিতে শুরু করে। ফলে, জনগণের অধিকার সংরক্ষণ এবং শাসক ও প্রশাসনের অন্যায় বা ক্ষমতার অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য স্বতন্ত্র মাজালিম আদালতের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই প্রেক্ষাপটেই পরবর্তী যুগগুলোতে মাজালিম আদালত মুসলিম বিচারিক ঐতিহ্যের একটি স্বতন্ত্র ও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিকশিত হয়।

মাজালিম আদালতের প্রাতিষ্ঠানিক সূচনা

উমাইয়া শাসনামলের প্রশাসনিক জটিলতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাজালিম আদালতের সূচনা ঘটে। সর্বপ্রথম উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিক ইবন মারওয়ান (মৃ. ৮৬ হি.) জনগণের অভিযোগ শোনার জন্য একটি নির্দিষ্ট দিন নির্ধারণ করেন, যেখানে বিচারপ্রার্থী তার অভিযোগ পেশ করতে পারত। তবে তিনি নিজে সরাসরি বিচার কার্য

সম্পাদন করতেন না; বরং জটিল বিষয়গুলো কাযি আবু ইদরিস আল-আউদির নিকট প্রেরণ করতেন। এ ব্যবস্থাপনায় আবু ইদরিস ছিলেন বিচারক এবং আবদুল মালিক ছিলেন প্রশাসনিক নির্দেশদাতা ও তত্ত্বাবধায়ক।[৩৬]

ইবরাহীম আল-বায়হাকীর (মৃ. ৩২০ হি.) এক বর্ণনায় দেখা যায়, খলিফা সুলায়মান ইবন আবদুল মালিকের (মৃ. ৯৯ হি.) শাসনকালে এক ব্যক্তি সাধারণ দরবারে উপস্থিত হয়ে তাকে কুরআনের একটি আয়াতের মাধ্যমে জুলুমের পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দেন। সেই ব্যক্তি রাজদরবারে এসে সরাসরি খলিফার নাম ধরে বলে: "হে সুলায়মান! আমি আপনাকে 'ঘোষণা দিবস' এর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি!" খলিফা কিছুটা অবাক হয়ে জানতে চাইলেন যে, এই 'ঘোষণা দিবস' আবার কী! তখন লোকটি উত্তর দিল: ঘোষণা দিবসের অর্থ হল আল্লাহ তাআলার এই উক্তি,

﴿فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾

> তাদের মধ্যে একজন ঘোষক ঘোষণা করবে: আল্লাহর লানত বর্ষণ হোক জালেমদের উপর।[৩৭]'

এ কথা শুনে খলিফা অশ্রুসিক্ত হলেন এবং তার প্রয়োজন সম্পর্কে জানতে চাইলেন। লোকটি বলল:"আমি আপনার অমুক ভূখণ্ডের প্রতিবেশী। আপনার প্রতিনিধি আমাকে অন্যায়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, যার ফলে আমি ও আমার পরিবার দুর্দশায় পড়েছি।" খলিফা তখন বললেন: "আমি ওই ভূখণ্ড তোমাকে দান করে দিলাম।"[৩৮]

কালপরিক্রমায় যখন উমর ইবন আবদুল আজিজ (মৃ. ১০১ হি.) খলিফা নিযুক্ত হন, তখন তিনি নিজেই সরাসরি মাজালিম বিচারকার্য সম্পাদনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি জনসাধারণের অভিযোগ সরাসরি শুনতেন, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় শরিয়তের সঠিক অনুশীলনকে অগ্রাধিকার দিতেন এবং বনি উমাইয়ার শাসনামলে হওয়া জুলুম-অবিচার সংশোধনের উদ্দেশ্যে অন্যায়ভাবে দখলকৃত সম্পদ প্রকৃত মালিকদের নিকট ফিরিয়ে দেন। তাঁর এই পদক্ষেপে অনেকে তাকে সতর্ক করে বলেন যে, এত সম্পদ ফেরত দিলে তাঁর জন্য ভবিষ্যতে সমস্যা তৈরি হতে পারে, তখন তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন: 'আমি প্রতিদিনের বিপদ থেকে বাঁচার চেষ্টা করি, কিন্তু কিয়ামতের দিনের বিপদ থেকে বাঁচার কোনো উপায় থাকবে না।'[৩৯]

---

36. Zalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān ibn Naṣr ibn 'Abd Allāh al-Shaizarī, *al-Manhaj al-Maslūk fī Siyāsat al-Mulūk*, ed. 'Alī 'Abd Allāh al-Mūsā (Jordan: Maktabat al-Manār, 1987), 564.
37. al-Qur'ān, 7:44
38. Ibrāhīm ibn Muḥammad al-Baihaqī, *al-maḥāsin wal-masāwī'* (Beirut: Dār Ṣādir), 492. (أنا جار في ضيعتك الفلانية وقد ظلمني وكيلك فأضرّ ذلك بي وبعيالي)
39. al-Shaizarī, *al-Manhaj al-Maslūk fī Siyāsat al-Mulūk*, 564-66. (كل يَوْم أخافه وأتقيه)

মাজালিম আদালতের প্রাতিষ্ঠানিক বিস্তার

আব্বাসিয় খলিফাগণও এই বিচারব্যবস্থার ধারাকে বহাল রাখেন। বরং বলা যায়, তাঁদের সময়ই এই ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি মজবুত হয়। সম্ভবত তাঁরা তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী বনু উমাইয়া থেকে এ ব্যাপারে পিছিয়ে থাকতে চাননি। এক বর্ণনায় দেখা যায়, এক ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি খলিফা আবু জাফর মানসুরকে তিরস্কার করছে এই বলে যে, উমাইয়াদের সময় কোনো মাজলুম ব্যক্তি সহজেই খলিফার কাছে যেতে পারত এবং খলিফা ঐ ব্যক্তির প্রাপ্য আদায় করে দিতেন। অথচ খলিফার মানসুরের কাছে সহজে যাওয়া যায় না আর তিনি যাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছেন তারাও সবসময় তাঁর কাছে পৌঁছাতে পারে না।[৪০] কারণ যাই হোক না কেনো, ইতিহাসের বর্ণনা থেকে জানা যায়, পরবর্তীতে আব্বাসিয় খলিফাগণ মাজালিম আদালতকে রাষ্ট্রের অপরিহার্য অংশে পরিণত করেন এবং তাঁদের অনেকেই স্ব-উদ্যোগে মাজালিম আদালত পরিচালনা করতেন।[৪১]

ইবনুল জাওযী উল্লেখ করেন, একবার আবু জাফর আল-মানসুর মানুষের অভিযোগ ও অন্যায়ের বিচার করার উদ্দেশ্যে মাজলিমে বসেছিলেন। তখন তিনি আর্মেনিয়ার গভর্নর ছিলেন। সেই সময় উসমান ইবনে নাহিকের একজন কর্মচারীর বিরুদ্ধে একজন লোক অভিযোগ পেশ করে। বিষয়টি ছিল তার সম্পদ সম্পর্কিত। ফলে আল-মানসুর নির্দেশ দেন যেন কর্মচারীকে বরখাস্ত করা হয় এবং অভিযোগকারীর সম্পদ তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।[৪২]

আরো বর্ণিত আছে, খেলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরে খলিফা আল-মানসুর ক্ষমতা থেকে অপসারিত কর্মকর্তাদেরকে নির্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ করে তাদের নিকট থেকে অর্থ আদায় করতেন। সংগৃহীত সম্পদ তিনি পৃথকভাবে সংরক্ষণ করে একে 'বাইত মাল আল-মাজালিম' (بيت مال المظالم) নামে অভিহিত করেছিলেন। পরবর্তীতে আল-মানসুর তাঁর উত্তরসূরি আল-মাহদীকে বলেন–"আমি এমন একটি

غير يَوْم الْقِيَامَة لَا وقيته)

40. Jamāl al-Dīn Abū al-Faraj ʿAbd al-Raḥmān ibn ʿAlī ibn Muḥammad al-Jawzī, *al-Muntaẓam fī Tārīkh al-Umam wa-al-Mulūk*, ed. Muḥammad ʿAbd al-Qādir ʿAṭā and Muṣṭafā ʿAbd al-Qādir ʿAṭā (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1992), 8:48-50. (وقد كانت بْنو أمية وكانت العرب لا ينتهي إليهم مظلوم إلا رفعت مظلمته)

41. আব্বাসিয় খলিফাদের মাজালিম আদালত পরিচালনার বিষয়টি এতটাই সুপ্রতিষ্ঠিত যে, সে সময়কে চিত্রায়নের জন্য আধুনিক পপ-কালচারেও মাজালিম আদালতের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়। যেমন, জনপ্রিয় ভিডিও গেম Assassin's Creed : mirage এর গেমপ্লের একটি পর্যায়ে (Judge and Executioner) দেখা যায়, প্রোটাগনিস্ট বাসিম ইবনে ইসহাক বাগদাদের মাজালিম আদালতে প্রবেশ করছে। এ সময় সে স্বগক্তি করে: The Mazalim courts are close. Dervis once told me it is where the commons can appeal when justice itself is dealt unjustly…. (কাছেই মাজালিম আদালত। দরবেশ একবার বলেছিল: সাধারণ মানুষ যখন বিচার ব্যবস্থার পক্ষ থেকে অবিচারের শিকার হয়, তখন তারা ন্যায়বিচারের জন্য মাজালিম আদালতে আবেদন করতে পারে) ।

42. al-Jawzī, *al-Muntaẓam*, 7:312.

ব্যবস্থা করেছি যা জনগণকে সন্তুষ্ট করবে, অথচ তোমার সম্পদ ব্যয় হবে না। আমার মৃত্যুর পর এই 'মাজালিম' সম্পদ আসল মালিকদের ফিরিয়ে দেবে, এতে তারা ও সাধারণ মানুষ উভয়েই তোমার প্রশংসা করবে।" খলিফা আল-মাহদী দায়িত্ব গ্রহণের পর এই নীতি বাস্তবায়ন করেন।[৪৩]

কবি মুআম্মাল (মৃ. ১৯০ হি.) নিজের সাথে ঘটা একটি ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বলেন, খলিফা আল-মাহদী (মৃ. ১৬৯ হি.) খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করলে ইবনু ছাওবানকে (ابن ثوبان) মাজালিম আদালতের দায়িত্বে নিয়োগ দেন। ইবনু ছাওবান 'রুসাফা'য়[৪৪] জনগণের অভিযোগ শুনতেন। যখনই তাঁর থলে অভিযোগপত্রে পূর্ণ হয়ে যেত, তখন তিনি সেগুলো মাহদীর কাছে উপস্থাপন করতেন। এক পর্যায়ে আমার একটি অভিযোগও সেখানে পৌঁছায়।

ইবনু ছাওবান সেটি নিয়ে মাহদীর কাছে প্রবেশ করলে, মাহদী অভিযোগপত্রগুলো দেখতে থাকেন এবং অবশেষে আমার অভিযোগপত্র পর্যন্ত পৌঁছান।[৪৫]

অন্য বর্ণনায় আছে, একবার খলিফা আল-হাদী (মৃ. ১৭০ হি.) ধারাবাহিকভাবে তিন দিন মাজালিম আদালত পরিচালনা করেননি। এরই মধ্যে একদিন হাররান শহরের এক ব্যক্তি তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে এ বিষয়ে সমালোচনামূলক মন্তব্য করেন যে, সাধারণ মানুষ এ ধরনের পরিস্থিতিতে সন্তুষ্ট বা অনুগত থাকবে না; কেননা তিনি তিন দিন ধরে কোনো অভিযোগ বিচার করেননি। এর পরিপ্রেক্ষিতে খলিফা তাঁর সহকারী আলী ইবন সালিহকে নির্দেশ দেন, জনগণকে একযোগে ও বিনা ক্রমে প্রবেশ করানোর অনুমতি দিতে (ائذن الناس علي بالجفلى لا بالنقرى)। খলিফার নির্দেশ অনুসারে পর্দা সরিয়ে দরজা উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। ফলে বিপুল সংখ্যক মানুষ একসাথে প্রবেশ করে এবং খলিফা রাত অবধি মাজালিম সংক্রান্ত অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তি করেন।[৪৬]

কাযি আবু ইউসুফ (মৃ. ১৮২ হি.) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল- খারাজ' এ খলিফা হারুন আল-রশিদকে (মৃ. ১৯৩ হি.) প্রতি মাসে একবার অথবা দুই মাসে একবার হলেও মাজালিম আদালতে বসার উপদেশ দিয়েছেন। তিনি এর মাধ্যমে আশা প্রকাশ করেছেন যে, মাজালিম আদালতে বসার মাধ্যমে খলিফা সেসব শাসকদের অন্তর্ভুক্ত

43. Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr ibn Yazīd ibn Kathīr ibn Ghalib al-Āmlī al-Ṭabarī, *Tārīkh al-Rusul wa al-Mulūk* (Beirut: Dār al-Turāth, 2nd ed., 1387 H). 8:81. (فاردد عليهم كل ما أخذ منهم، فإنك تستحمد إليهم وإلى العامة)

44. 'রুসাফা' বলতে আব্বাসিয়দের প্রশাসনিক ভবনকে বোঝানো হয়। আবার বাগদাদের দজলা নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত একটি ভুখণ্ডকেও 'রুসাফা' বলা হতো। আব্বাসি যুগের কবি আলী ইবনে জাহামের কবিতা: عُيونُ المَها بَينَ الرُصافَةِ وَالجِسرِ+ جَلَبنَ الهَوى مِن حَيثُ أَدري وَلا أَدري (অর্থ: রুসাফা ও সেতুর মাঝে হরিণ-চক্ষু ওয়ালী রমণীগণ + আমার হৃদয়ে প্রেম জাগালেন এমনভাবে –যা আমি জানি, তবু যেন জানি না)। এখানে উভয় অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হতে পারে।

45. al-Jawzī, *al-Muntaẓam*, 7:345.

46. al-Baihaqī, *al-maḥāsin wal-masāwī*, 191.

হবেন না যারা প্রজাদের প্রয়োজন থেকে নিজেকে আড়াল করে রাখে। ইমাম আবু ইউসুফের মতে, মাজালিম আদালতে কয়েকবার বসলেই এর প্রভাব শহর ও অঞ্চলগুলোতে ছড়িয়ে পড়বে। তখন অত্যাচারীরা ভয়ে অন্যায় করা থেকে বিরত থাকবে, আর দুর্বল-নিপীড়িতরা আশা পাবে যে, খলিফা তাদের কথা শুনেন এবং তাদের পক্ষে আছেন। এতে খলিফার প্রতি জনসাধারণের মনোবল দৃঢ় হবে এবং তাঁর জন্য বেশি বেশি দুআ করবে।[৪৭]

পরবর্তীতে, তুর্কি এবং অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর বিদ্রোহজনিত কারণে সৃষ্ট রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য খলিফাগণ জনসম্মুখে বসে বিচার করার সুযোগ হারিয়ে ফেলেন। ফলে মাজালিম সংক্রান্ত দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব তাদের মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের হাতে অর্পিত হয়।[৪৮]

উক্ত আলোচনা থেকে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়। তা হল:

- মাজালিম আদালত উমাইয়া যুগে ব্যক্তিনির্ভর (আরো নির্দিষ্ট করে বললে, 'খলিফা-নির্ভর') ছিল, কিন্তু আব্বাসিয় যুগে এসে তা অনেকাংশই প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে।
- এই বিচার প্রক্রিয়া খলিফাদের ন্যায়বিচারের ভাবমূর্তি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। জনমতের চাপ খলিফাদের এই প্রতিষ্ঠানকে সক্রিয় রাখতে বাধ্য করত। খলিফাগণ স্বয়ং এই আদালত পরিচালনার পাশাপাশি প্রতিনিধিও নিয়োগ দিতেন যা এর প্রাতিষ্ঠিনিকীকরণের একটি প্রমাণ।
- এই আদালত শাসকদের বৈধতা রক্ষার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। কারণ এই ব্যবস্থাপনা সাধারণ জনমানসে এ স্বস্তি দিত যে, ক্ষমতাবানরাও জবাবদিহিতার বাইরে নন। ফলে শাসকের গ্রহণযোগ্যতা জনসাধারণের নিকট বৃদ্ধি পেত। যেমনটা কাযি আবু ইউসুফের রচনার আমরা দেখতে পাই।

'আল-আহকাম আল-সুলতানিয়্যাহ': আল-মাওয়ার্দি ও আবু ইয়ালা আল ফার্‌রা

আব্বাসি খেলাফতের দীর্ঘ সময়জুড়ে মাজালিম আদালতের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি ক্রমশ সুদৃঢ় হয়ে ওঠার কিছু দৃষ্টান্ত উপরের আলোচনায় উপস্থাপিত হয়েছে। এ সময় শুধুমাত্র বাস্তব প্রয়োগ নয়, বরং এর একটি তাত্ত্বিক ও নীতিগত কাঠামোও গড়ে ওঠে। বিশেষ করে গবেষকদের নিকটে ইমাম আল-মাওয়ার্দির বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-আহকাম আস-সুলত্বানিয়্যাহ' এ ব্যাপারে 'প্রামাণ্য গ্রন্থ' (canonical text) হিসেবে বিবেচিত। এ গ্রন্থটি মূলত রাষ্ট্রের সামগ্রিক শাসনব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত

47. Qādī Abū Yūsuf Ya'qūb ibn Ibrārīm, *Kitāb al-Kharāj* (Beirūt: Dār al-Ma'rifah, 1979), 112.

48. al-Shaizarī, *al-Manhaj al-Maslūk fī Siyāsat al-Mulūk*, 566. (ثمَّ احتجب الْخُلَفَاء لتظاهر التّرْك وَغَيرهم عَلَيْهِم ودفعوا أَمر الْمَظَالِم إِلَى وزرائهم)

হয়েছে। এছাড়াও তিনি রাষ্ট্রপ্রধান নিয়োগ থেকে শুরু করে মন্ত্রী, গভর্নর এবং সেনাপতি ও জনকল্যাণে নিয়োজিত বিভিন্ন কর্মকর্তাদের নিয়োগ ও দায়িত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

প্রফেসর নেইলসেন এর মতে, তিনি খলিফার রাজনৈতিক কর্তৃত্ব টিকিয়ে রাখার পক্ষে, বিশেষ করে বুয়াইহি আমাত্যদের প্রভাবের বিরুদ্ধে খলিফার অবস্থানকে সমর্থন করার জন্য এ গ্রন্থ রচনা করেন।[৪৯]

কারণ যাই থাকুক না কেন, উক্ত গ্রন্থেই তিনি সর্বপ্রথম মাজালিম বিচারব্যবস্থার উদ্দেশ্য, পরিধি ও প্রশাসনিক রূপায়ণকে পদ্ধতিগতভাবে বিশ্লেষণ করেন, যা পরবর্তী সময়ে এর তাত্ত্বিক ভিত্তি রূপে স্বীকৃত হয়।

আল-মাওয়ার্দির সমসাময়িক কাযি আবু ইয়ালা আল-ফার্‌রা 'আল-আহকাম আস-সুলত্বানিয়্যাহ' নামে আরেকটি গ্রন্থ রচনা করেন এবং তাঁদের মাজালিম সংক্রান্ত আলোচনার সামগ্রিক কাঠামো প্রায় অভিন্ন। উভয়েই মাজালিম প্রশাসকের গুণাবলি দিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন, যেখানে মূল গুণ হিসেবে তাঁরা শারীরিক প্রভাব ও চারিত্রিক সততার কথা বলেছেন; কিন্তু বিস্ময়করভাবে কেউই ফিকহ বা আইন-জ্ঞানকে অপরিহার্য বলে উল্লেখ করেননি। এরপর উভয়েই মাজালিম প্রতিষ্ঠানের ঐতিহাসিক বিবর্তন তুলে ধরেছেন, যেখানে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আলী ইবন আবী তালিব, আব্দুল মালিক ইবন মারওয়ান, ওমর ইবন আব্দুল আজিজ এবং বেশ কিছু আব্বাসিয় খলিফার নাম এসেছে। উভয়েই একমত যে, চার খলিফার যুগে মুসলমানদের নৈতিক অবস্থা উৎকৃষ্ট ছিল এবং পরবর্তীতে তা অবনতি লাভ করে। অতঃপর উভয়ে মাজালিম প্রশাসকের কর্তৃত্ব, সাধারণ আদালতের সঙ্গে তুলনা, এবং কার্যপ্রণালি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তবে কিছু বিষয়ে এই দুই গ্রন্থের আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন :

- **ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ ব্যবহারে পার্থক্য**

আল-মাওয়ার্দি তাঁর আইনি মতের পক্ষে ঐতিহাসিক ঘটনা ও কবিতা যুক্ত করেন, বিশেষ করে খলিফাদের জীবনী থেকে উদাহরণ তুলে ধরেন। তিনি নয়টি স্থানে এমন ইতিহাস সংযোজন করেন এবং এর মধ্যে পাঁচটি স্থানে কবিতাও অন্তর্ভুক্ত করেন।

উদাহরণস্বরূপ, তিনি 'উমর ইবন আবদুল আজিজ'-এর একটি বর্ণনার মাধ্যমে দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধ অবস্থান ব্যাখ্যা করেন।

অন্যদিকে, কাযি আবু ইয়ালা তাঁর রচনায় ঐতিহাসিক প্রমাণ পুরোপুরি বাদ দিয়েছেন। তাঁর লেখনীতে কেবল সংক্ষিপ্ত, আইনভিত্তিক বক্তব্য স্থান পেয়েছে। সম্ভবনা আছে যে, তিনি ইচ্ছা করেই এ বিষয়টি বাদ দিয়েছেন।

49. J. S. Nielsen, "Mazālim and Dār al-ʿAdl under the Early Mamluks," *The Muslim World* 66, no. 2 (1976): 115, https://doi.org/10.1111/j.1478-1913.1976.tb03191.x .

- **প্রাক-ইসলামী ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি**

উভয় লেখকই ইসলামপূর্ব পারস্য তথা সাসানিয় সাম্রাজ্যের মাজালিম আদালতের ধরন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। তবে আল-মাওয়ার্দি আরও একটি দেড় পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনা জুড়ে দিয়েছেন আরবদের সামাজিক বাস্তবতা নিয়ে, যা আবু ইয়ালার লেখায় অনুপস্থিত।

আল-মাওয়ার্দি এখানে 'হিলফুল ফুযুল' এ আল্লাহর রাসূল ﷺ -এর উপস্থিতি উল্লেখ করে বলেন যে, নবী হওয়ার পূর্বেও তাঁর অংশগ্রহণ একে একটি নীতিগত দৃষ্টান্তে পরিণত করেছিল। এই দৃষ্টিভঙ্গি আবু ইয়ালা এড়িয়ে গেছেন।

- **রাজনৈতিক মনোভাব**

আবু ইয়ালার ইতিহাস বর্জনের পেছনে সম্ভবত তাঁর হাম্বলি মাজহাবের প্রভাব রয়েছে, যা সাধারণভাবে খলিফাদের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখলেও তাঁদের নৈতিকতা ও রাজনৈতিক পরিবেশ নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে।

আল-মাওয়ার্দির চিন্তায় খলিফাদের প্রতি সম্মান ও আইনি অনুসরণমূলক প্রবণতা লক্ষ করা যায়, যা তাঁর শাফেয়ি ও রাষ্ট্রপন্থি অবস্থানের প্রকাশ।

মোদ্দা কথা, মাজালিমের ন্যায়বিচারিক কাঠামোকে উপস্থাপন করতে আল-মাওয়ার্দি রাজনৈতিক ক্ষমতাকেও এক ধরনের আইনগত ভিত্তি দিতে চান, যা আবু ইয়ালা সতর্কভাবে এড়িয়ে গেছেন।[৫০]

তবে এটা এখনও ব্যাখ্যাতীত যে, কেন আল-মাওয়ার্দির পূর্বে 'মাজালিম'কে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান ধরে নিয়ে কোনো তাত্ত্বিক কাঠামো গড়ে ওঠেনি– এবং কেন তা শেষ পর্যন্ত বিশেষভাবে তাঁর মাধ্যমেই উদ্ভূত হলো, যেখানে পরবর্তী চিন্তাবিদগণ তাঁর তত্ত্বকেই পুনরাবৃত্তি করেছেন মাত্র। যদিও স্পষ্টতই দেখা যায়, আল-মাওয়ার্দির পূর্বেও মাজালিম ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অনেকেই অবগত ছিলেন (যেমন কাযি আবু ইউসুফ) এবং তাঁদের রচনায় এর গুরুত্বও উল্লেখ করেছেন।

মিসর ও অন্যান্য অঞ্চলে মাজালিম আদালতের বর্ণনা

আল-মাকরিযির বর্ণনা মতে, মিসরে মাজালিম আদালতের জন্য প্রথম বসেছিলেন আমির আবুল-আব্বাস আহমদ ইবন তুলুন। তিনি প্রতি সপ্তাহে দুই দিন বসতেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আবুল জাইশ খুমারুয়াহ (خمارويه) ক্ষমতায় আসেন। তখন তিনি ২৭৩ হিজরির শাবান মাসে মাজালিম আদালতের দায়িত্বে নিয়োগ দেন মুহাম্মদ ইবন উবাইদাহ ইবন হারবকে।

এরপর ৩৪০ হিজরিতে আবুল মিসক কাফুর আল-ইখশিদি এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

[50]. বিস্তারিত দেখুন: Nimrod Hurvitz, *Competing Texts: The Relationship Between al-Māwardī's and Abū Yaʿlā's al-Aḥkām al-Sulṭāniyya* (Islamic Legal Studies Program, Harvard Law School, 2007), 21-25.

তখন তিনি ছিলেন আমির আবুল কাসিম উনুজুর ইবন আল-ইখশিদের প্রতিনিধি। তিনি এজন্য একটি বিশেষ পরিষদ গঠন করেন, যেখানে তিনি প্রতি শনিবার বসতেন। সেখানে উপস্থিত থাকতেন মন্ত্রী আবুল ফযল জাফর ইবনুল ফুরাত, অন্যান্য কাযি, ফকিহ, সাক্ষীগণ এবং শহরের প্রধান ব্যক্তিরা। কাফুর তাঁর জীবদ্দশায় মিসরে মৃত্যু পর্যন্ত এ ব্যবস্থা চালু রাখেন।[৫১]

যখন সিরিয়া অঞ্চলের শাসনভার ন্যায়পরায়ণ শাসক সুলতান নূরুদ্দীন মাহমুদ যিনকি রহ. (মৃ. ৫৬৯ হি./১১৭৪ খৃ.) এর হাতে ন্যস্ত হয়, তখন তিনি পূর্বতন ধারাকে নতুন আঙ্গিকে পুনর্জীবিত করেন। তিনি দামেশকে 'দারুল আদল' নামে একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় দেখা যায়, দামেশকে তাঁর শাসনামলে প্রভাবশালী আসাদুদ্দীন শিরকুহর অধীনস্থ আমলাদের দ্বারা জনসাধারণের উপর অন্যায় আচরণ ও অবিচারের নানাবিধ অভিযোগ উত্থাপিত হতে থাকে। জনগণ এই অভিযোগগুলো তৎকালীন বিচারপতি কাযি কামালুদ্দীন শাহরাযুরীর নিকট পেশ করলেও তিনি একে প্রতিহত করতে অক্ষম ছিলেন। এই পরিস্থিতি নূরুদ্দীনকে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে এবং ফলশ্রুতিতে তিনি দারুল আদল প্রতিষ্ঠা করেন। 'দারুল আদল' প্রতিষ্ঠার পর শিরকুহের কাছে পৌঁছালে তিনি তার আমলাদের সমবেত করে ঘোষণা দেন যে, "নূরুদ্দীন কেবল আমার কারণেই এই দারুল আদল নির্মাণ করছেন। আল্লাহর কসম! তোমাদের কারও কারণে যদি আমাকে এখানে জবাবদিহিতার জন্য হাজির হতে হয়, তাহলে আমি তাকে শূলে চড়াবো। তাই যাদের সঙ্গে সম্পত্তি বা অন্য যেকোনো বিষয়ে বিবাদ রয়েছে, অবিলম্বে তা মীমাংসা করো এবং যথাসম্ভব প্রতিপক্ষকে সন্তুষ্ট করো। এতে যদি আমার সব সম্পত্তি বিলুপ্ত হয়ে যায়, তবে যাক।" তাঁর এ কথায় আমলারা আপত্তি উত্থাপন করে বলে, "এভাবে মিটমাট করতে চাইলে মানুষ অতিরিক্ত দাবি জানাবে।" জবাবে শিরকুহ স্পষ্ট করে বলেন যে, "নূরুদ্দীনের দৃষ্টিতে অত্যাচারী প্রতিপন্ন হওয়ার চাইতে ধনসম্পদ হারানো আমার জন্য সহজ।" পরবর্তীতে তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী সাক্ষীদের উপস্থিতিতে আমলারা প্রতিপক্ষের সঙ্গে আপস-মীমাংসা সম্পন্ন করে ফেলে। এদিকে নূরুদ্দীন দামেশকে এসে সপ্তাহে দুই দিন দারুল আদলে কাযি ও আলেমদের উপস্থিতিতে বিচার কার্য পরিচালনা শুরু করেন। কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে শিরকুহের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ উপস্থিত না হওয়ায় তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং কারণ অনুসন্ধান করেন। তখন তাঁকে সমগ্র ঘটনাবলি অবহিত করা হলে নূরুদ্দীন আল্লাহর শোকর আদায় করে বলেন, "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের সহযোগীদের এমনভাবে পরিচালিত করেছেন যে, তারা আমাদের নিকট হাজির হওয়ার আগেই নিজেরাই ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে।"[৫২]

[51]. al-Maqrīzī, *al-Mawāʿiẓ wa'l-Iʿtibār*, 3:362.

[52]. Abū al-Fidāʾ Ismāʿīl ibn ʿUmar ibn Kathīr, *al-Bidāyah wa-al-Nihāyah*, ed. ʿAlī Shīrī (Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī, 1988), 12:346; al-Maqrīzī, *al-Mawāʿiẓ wa'l-Iʿtibār bi-Dhikr al-Khiṭaṭ wa'l-Āthār,* 3:363. (الحمد الله الذي جعل أصحابنا ينصفون من أنفسهم قبل حضورهم عندنا)

ইবনু আসাকির (মৃ. ৫৭১ হি.) এর বর্ণনামতে সুলতান নূরুদ্দীন শুধু দামেশক নয়, বরং তাঁর শাসনাধীন বেশিরভাগ অঞ্চলেই 'দারুল আদল' নির্মাণ করেছিলেন। তিনি নিজেই বেশিরভাগ সময় বিচারক ও ফকীহদের উপস্থিতিতে মাজলুমদের অভিযোগ ও দাবি-দাওয়া শুনতেন এবং সেগুলোর সমাধান করতেন।[৫৩]

প্রফেসর নাসের রাব্বাত বলেন, দারুল আদল কেবল মাজালিম বিচার ব্যবস্থার একটি উন্নত রূপ ছিল না। বরং এটি ছিল এক "ব্যতিক্রমী যুগের মৌলিক সৃষ্টি"।[৫৪]

তৎকালীন শাসকদের নিজেদেরকে জনগণের মাঝে ন্যায়পরায়ণ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার একটা জোর তাগিদ ছিল। বিশেষত মামলুক শাসকগণ এ ব্যাপারটিকে বেশ গুরুত্বের সাথে নিয়েছিলেন। দাসবংশ হওয়ার কারণে তাদের ক্ষমতা গ্রহণের বিষয়টি স্বাভাবিক (undisputed) ছিল না।[৫৫] ইবনে কাসীর বর্ণনা করেন, সুলতান মুহাম্মাদ ইবনে কালাউন দারুল আদলে উপস্থিত হতেন এবং নিজেই মাজালিমের বিষয়গুলো তদারকি করতেন।[৫৬]

প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে আমরা দেখবো যে, মামলুক সুলতানগণ খুব জাঁক-জমকের সাথে দারুল আদলে বসে মাজালিম আদালতের বিষয়গুলো তদারকি করতেন।

মাজালিম আদালত মামলুক যুগের শেষ পর্যন্ত টিকে ছিল। মামলুক সাম্রাজ্য ভেঙে যাওয়ার পর তাদের মাজালিম আদালতও বন্ধ হয়ে যায়। অটোমান সুলতান সেলিম (১৫১২-২০ খ্রি.) এই ব্যবস্থা চালু রাখেননি।[৫৭] এভাবেই মামলুক আমলে মিসর ও সিরিয়ার আইন ব্যবস্থায় বড় ভূমিকা রাখা এই আদালতের ইতি ঘটে।

---

53. Abū al-Qāsim ʿAlī ibn al-Ḥasan ibn Hibat Allāh ibn ʿAsākir, *Tārīkh Dimashq*, ed. ʿAmr ibn Gharāmah (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), 57:120.

54. Nasser O. Rabbat, "The Ideological Significance of the Dār al-Adl in the Medieval Islamic Orient," *International Journal of Middle East Studies* 27, no. 1 (February 1995): 4. (*an original innovation of an extraordinary time)*

৫৫. আল-মাকরিযি এক আরব বেদুঈন শাইখের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন, যিনি ৬৫১ হি./১২৫৩ খৃস্টাব্দে মামলুকদের ক্ষমতা দখল প্রসঙ্গে নিজের বিতৃষ্ণা প্রকাশ করে বলেন: "এই ভূমির প্রকৃত অধিপতি আমরাই। শাসনের অধিকার মামলুকদের চেয়ে আমাদের বেশি। এটাই যথেষ্ঠ যে, আমরা আয়্যুবিদের শাসন মেনে নিয়েছিলাম, যদিও তারা ছিল বহিরাগত...জোরপূর্বক এ অঞ্চল দখল করেছিল। আর মামলুকরা তো এদেরই কৃতদাস মাত্র (إِنَّمَا هم عبيد للخوارج)। দেখুন: al-Maqrīzī, *al-Sulūk li Maʻrifat Duwal al-Mulūk,* ed. Muḥammad ʻAbd al-Qādir ʻAṭā (Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah, 1997), 1:479.

56. Ibn Kathīr, *al-Bidāyah wa-al-Nihāyah*, 14:53

57. সুলতান সেলিম এটা বন্ধ করলেও পরবর্তী সময়ে অটোমানদের শেষের দিকে এই ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে (১৭১৩ খৃ.) সুইডেন রাশিয়ার সাথে এক দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এ সময়ে সুইডেনের রাজা দ্বাদশ চার্লস (King Charles XII) তুরস্কে নির্বাসন যাপন করেন। যুদ্ধকালীন সময়ে সুইডেনে, সরকারি কর্মচারীদের কাজের তত্ত্বাবধান করেন Chancellor of Justice (JK) নামক রাজার মনোনীত একজন প্রতিনিধি। দীর্ঘ বার বছরকাল তুরস্কে অবস্থানকালে, অটোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সে সময়ে সক্রিয় দিওয়ান-আল-মাজালিম এবং আল-হিস্‌বাহ প্রতিষ্ঠান দু'টি রাজা চার্লসের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে। রাশিয়ার সাথে যুদ্ধশেষে দেশে ফিরে রাজা দ্বাদশ চার্লস রাজ

মামলুক সুলতানরা নিজেদের ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে দেখাতে এবং মুসলিম শাসক হিসেবে তাদের দায়িত্ব পালন করতে এটিকে ব্যবহার করতেন। মূল কাঠামোটা তারা আয়্যুবিদের কাছ থেকে নিয়েছিল, তবে কিছু পরিবর্তনও তাঁদের হাতে হয়েছিল। বেশকিছু সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও সাধারণ জনগণকে ন্যায়বিচার পাইয়ে দিতে কিছু সুলতান সত্যিই চেষ্টা করেছেন। স্থিতিশীল সময়ে এই আদালত অন্যায় রোধে সত্যিই কার্যকর ছিল। মামলুক সমাজে সবাই এটিকে সুলতানের বৈধতার অপরিহার্য অংশ মনে করত এবং তাঁদের সময়ে প্রতিষ্ঠানটি কখনো প্রশ্নবিদ্ধ হয়নি।[৫৮]

মাজালিম আদালতের কাঠামোবিন্যাস

এই প্রতিষ্ঠানটি প্রশাসনিক ক্ষমতা থেকে পুরোপুরি স্বাধীন ছিল না, বিশেষ করে যখন এর প্রধানের দায়িত্বে খলিফা নিজেই থাকতেন। যেহেতু এই আদালত বিচার, প্রশাসন ও বাস্তবায়ন–এই তিনটি দায়িত্ব একত্রে পালন করত, তাই কার্যকরভাবে দায়িত্ব পালন নিশ্চিত করার জন্য এর গঠনও তেমনভাবে করা হতো। ইমাম আল-মাওয়ার্দির মতে, এই দিওয়ান গঠিত হতো পাঁচটি শ্রেণির ব্যক্তিদের সমন্বয়ে। তাঁরা হলেন:

১. মাজালিম প্রধান (নাযিরুল মাজালিম)

শুরুতে খলিফা নিজেই এই দায়িত্ব পালন করতেন, বিশেষত আব্বাসিয় খিলাফতের প্রাথমিক সময় পর্যন্ত। পরবর্তী সময়ে যখন রাষ্ট্র বিস্তৃত হয়, তখন এই দায়িত্বে নিযুক্ত হতেন পূর্ণক্ষমতা-প্রাপ্ত মন্ত্রী ও অঞ্চলপ্রধানগণ। তাঁদের ক্ষেত্রে শর্ত ছিল–ব্যক্তিত্বে দৃঢ়, মর্যাদাশালী, প্রভাবশালী ও সততার দৃষ্টান্ত হতে হবে।

২. ফকিহ (ইসলামী আইনজ্ঞ)

মাজালিম আদালতের প্রধান যদি কোনো বিষয়ে সন্দেহে পড়েন বা সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধায় থাকেন, তখন তিনি তাঁদের শরণাপন্ন হতেন।

৩. লেখকগণ

আদালতের কার্যক্রম নথিভুক্ত করার জন্য নিযুক্ত থাকতেন; তাঁরা নির্দিষ্ট রেজিস্টারে সবকিছু লিপিবদ্ধ করতেন।

৪. সাক্ষীগণ

মাজালিম আদালতের সিদ্ধান্ত ও রায়সমূহে জনসাধারণের পক্ষ থেকে সাক্ষ্য দিতেন, যা এক ধরনের গণতান্ত্রিক নজরদারির ব্যবস্থা ছিল।

কর্মচারীদের আইন বিরোধী ও নির্যাতনমূলক আচরণের বিরুদ্ধে জনসাধারণের রক্ষাকবচ হিসেবে, ইসলামী আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক রক্ষাব্যবস্থার আদলে Justiti Ombudsman (JO) এবং ক্রেতা সাধারণের স্বার্থ রক্ষার জন্য Consumer Ombudsman (KO) নামে দু'টি প্রতিষ্ঠান প্রবর্তন করেন। দেখুন: Abdun Noor, *Lok Proshashon: Shangatan, Procria abong Anuchintha*, 148-9.

58. Albrecht Fuess, "Ẓulm by Maẓālim? The Political Implications of the Use of Maẓālim," *Mamlūk Studies Review* 13, no. 1 (2009), 141–42, doi:10.6082/JKWP-DH05

৫. পুলিশ ও অন্যান্য সহযোগী
তাঁরা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও প্রয়োজনে বলপ্রয়োগ করে আদালতের রায় কার্যকর করতেন।[৫৯]

৮ম হিজরি শতকের সিরীয় ইতিহাসবিদ আহমাদ ইবনে ফাযলুল্লাহ আল-উমারি (মৃ. ৭৪৯ হি.)-এর রচনায় মামলুক আমলের সুলতানদের মাজালিম আদালতে বসার বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়। তাঁর বর্ণনায় দেখা যায়, মামলুক সুলতানদের প্রচলিত রীতি ছিল, প্রতি সোমবার (রমযান ছাড়া) সকালে কেল্লায় অবস্থিত বিশেষ ইওয়ানে (الإيوان) মাজালিম আদালত পরিচালনা করা। এটি অনুষ্ঠিত হতো তাঁর প্রাসাদের দরজার কাছে এক প্রশস্ত ও উঁচু ইওয়ানে, যেটিকে বলা হতো 'দারুল আদল'। এখানে সাধারণ জনগণের সেবা প্রদান, প্রেরিত বিদেশি দূতদের উপস্থিতি ইত্যাদি বিষয়াবলি দেখভাল করা হতো।

যখন সুলতান মাজালিমের জন্য বসতেন, তখন তিনি এমন একটি চেয়ারে বসতেন, যার উপর বসলে তার পা প্রায় মাটি স্পর্শ করত। এই চেয়ারটি রাজকীয় সিংহাসনের (تخت الملك) পাশে স্থাপিত থাকত। তার ডানদিকে বসতেন চার মাজহাবের প্রধান বিচারপতিগণ, তারপর রাষ্ট্রীয় কোষাগার প্রতিনিধি, তারপর বাজার তত্ত্বাবধায়ক। তাঁর বামদিকে বসতেন রাজসচিব (كاتب السر), এবং তাঁর সামনে বসতেন সেনাবাহিনীর পরিদর্শক (ناظر الجيش) এবং নথি-স্বাক্ষরকারীদের একটি দল। মাঝে মাঝে মন্ত্রীরাও উপস্থিত থাকতেন। মন্ত্রী যদি প্রশাসনিক বিভাগের হতেন তবে সচিবের পাশে বসতেন, আর যদি সামরিক বিভাগের হতেন তবে দূরে দাঁড়িয়ে উপস্থিত থাকতেন।

সুলতানের পেছনে তার ডান ও বামে দুটি সারিতে দাঁড়িয়ে থাকতেন অস্ত্রধারী প্রহরী, পোশাক রক্ষক (الجمدارية) এবং খাসকিয়া (الخاصكية) বা বিশেষ রক্ষী। তার ডান ও বামদিকে প্রায় পাঁচ হাত দূরত্বে বসতেন বয়োজ্যেষ্ঠ সেনাপতিগণ, যারা পরামর্শদাতা আমির ছিলেন। তাদের নিচে বড় আমিরগণ এবং কর্মকর্তারা দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং বাকি আমিরগণ পরামর্শদাতা আমিরদের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকতেন।

আর সভার চারপাশে অবস্থান করত দারোয়ান এবং আবেদনপত্র বাহকগণ (الدوادارية) যাঁরা জনগণের অভিযোগ, দরিদ্রদের আরজি ও অন্যান্য নথিপত্র সুলতানের সামনে পেশ করতেন।

এগুলো তাঁর কাছে পড়া হতো, যেসব বিষয়ে বিচারকদের সাথে পরামর্শের প্রয়োজন হতো সে বিষয়ে তিনি তাদের সাথে পরামর্শ করতেন, সামরিক বিষয়াদি সম্পর্কিত বিষয়ে তিনি 'হাজেব' (প্রধান কর্মকর্তা) এবং সেনা সচিব (كاتب الجيش) সাথে আলোচনা করতেন এবং বাকি বিষয়ে তিনি যা উচিত মনে করতেন তার আদেশ দিতেন।[৬০]

---

59. al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, 106.
60. Aḥmad ibn Yaḥyā ibn Faḍl Allāh al-ʿUmarī, *Masālik al-abṣār fī mamālik al-amṣār*, (Abu Dhabi: al-Majmaʿ al-Thaqāfī, 2002), 3:436-7.

আলোচ্য সূত্র থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, আব্বাসি আমলের ইমাম আল-মাওয়ার্দি (৫ম হিজরি) এবং মামলুক যুগের ইবনে ফাযলুল্লাহ আল-উমারি (৮ম হিজরি)–শত শত বছরের ব্যবধানেও মাজালিম আদালতের কাঠামোবিন্যাস নিয়ে প্রায় একইরূপ বিবরণ প্রদান করেছেন। উভয়েই খলিফার উপস্থিতি, শরয়ী বিচারক, প্রশাসনিক ও সামরিক প্রতিনিধিদের উপস্থিতি এবং দরবারে জনসাধারণের অভিযোগ শোনার বিশেষ প্রক্রিয়ার যে চিত্র এঁকেছেন, তা কেবল তাঁদের মধ্যকার বর্ণনাগত সামঞ্জস্যই প্রকাশ করে না; বরং মাজালিম আদালত একটি প্রাতিষ্ঠানিক ঐতিহ্য হিসেবে মুসলিম শাসনব্যবস্থায় কতটা দৃঢ়ভাবে প্রোথিত ছিল, সেটিও প্রতিফলিত করে। এ থেকে আরো প্রতীয়মান হয় যে, মাজালিম আদালত শুধু তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক প্রয়োজনে গঠিত কোনো প্রতিষ্ঠান ছিল না, বরং ধারাবাহিকতা ও স্থায়িত্বের কারণে মুসলিম বিচারব্যবস্থার ইতিহাসে এটি এক স্থায়ী ও কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে।

মাজালিম আদালতের কিছু পর্যালোচনা

মাজালিম আদালত নিয়ে যাঁরা গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন, তাঁদের রচনায় এর গুরুত্ব ও কার্যকারিতা বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। পাশাপাশি তাঁরা এমন কিছু বিষয়ে আলোকপাত করেছেন, যা ভবিষ্যৎ গবেষণায় আরও ব্যাখ্যার সুযোগ রাখে। নিম্নে এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হল:

- **মাজালিম মামলা নির্ধারণ**

মাজালিম বিচারব্যবস্থা সম্পর্কিত একটি মৌলিক প্রশ্ন হলো– কোন ধরনের মামলাকে 'মাজালিম মামলা' হিসেবে গণ্য করা হবে? বাস্তবে এ বিষয়ে স্পষ্টতা সবসময় দেখা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ বিচারব্যবস্থার আওতায় পড়া মামলার সাথে মাজালিম আদালতের অধিক্ষেত্র মিলেমিশে যায়। ফলে অন্যান্য বিচারিক কাঠামোর সাথে মাজালিম আদালতের পার্থক্যসূচক সীমারেখা সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত নয়।

- **মাজালিম আদালতের রাজনৈতিক ব্যবহার**

অনেক গবেষকগণ মাজালিম আদালতকে শাসকদের হাতে একটি রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তাঁদের কেউ এটাকে শাসকের 'সর্বাধিপত্যমূলক নীতি'র (absolutist governance)[৬১] বহি:প্রকাশ হিসেবে উল্লেখ করেছেন, আবার কেউ মনে করেন এই আদালতের মাধ্যমে শাসকেরা পুনরায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতেন সেই বিচারব্যবস্থার উপর, যা তাঁরা স্থায়ীভাবে মুসলিম ফকিহ বা বিচারকদের নিকট অর্পণ করেছিলেন।[৬২]

---

61. Wael B. Hallaq, *The Origins and Evolution of Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 99.
62. Mathieu Tillier, "The Mazalim in Historiography," in *The Oxford Handbook of Islamic Law*, ed. Anver M. Emon and Rumee Ahmed (Oxford: Oxford University Press, 2018), 374.

এই ব্যাখ্যাগুলোর মধ্যে কিছুটা হলেও নেতিবাচক সুর বিদ্যমান। এটা সত্য, ইতিহাসের যে বর্ণনা আমাদের সামনে আছে তা বিশ্লেষণ করলে এই সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব যে, মুসলিম শাসক বা খলিফাগণ মাজালিম আদালতে বিচারকার্য পরিচালনা করাকে নিজেদের জন্য মর্যাদা ও কর্তৃত্বের বহিঃপ্রকাশ বিষয় হিসেবে ভাবতেন। অন্তত ঐতিহাসিকগণ বিষয়টিকে সেভাবেই তুলে ধরেছেন। তবে এ ক্ষেত্রে দুটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে :

এক: যদি কোনো প্রশাসনিক কাঠামোর মাধ্যমে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়, তবে কেবলমাত্র *"শাসকের ক্ষমতা সুসংহত হয়"*- এই যুক্তিতে সেটিকে নেতিবাচক হিসেবে দেখার কোনো কারণ নেই।

দুই: শাসক যখন ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবেন, তখন তিনি ন্যায়বিচারক হিসেবেই বিবেচিত হবেন।

তাঁর অভিপ্রায় আসলে কী ছিল? তিনি কি ন্যায়বিচারের স্বার্থেই ন্যায়বিচার করেছেন ? নাকি এতে লোকদেখানো ব্যাপার আছে ? এই ন্যায়বিচারের মাধ্যমে তাঁর জাগতিক অর্জন কতখানি?

এ ধরনের প্রশ্ন এবং এর উপর ভিত্তি করে নানারকমের অনুমানমূলক বিশ্লেষণের যে বহুমাত্রিক পসরা সাজানো হয়, ইসলামী জ্ঞানতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণে সেগুলোর আসলে তেমন কোনো প্রায়োগিক উপকারিতা নেই। বরং তা ফলাফলহীন অনর্থক আলোচনা। আল্লাহর রাসূল ﷺ স্পষ্ট করে বলেছেন, "আমাকে মানুষের অন্তর ছিদ্র করে, পেট ফেঁড়ে (ঈমানের উপস্থিতি) দেখার জন্য বলা হয়নি"।[৬৩] আল্লাহর রাসূল ﷺ এর উক্ত বাণী থেকে মুসলিম আইনবেত্তাগণ (jurist) এই মূলনীতি উদ্ভাবন করেছেন যে, জাগতিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে মানুষকে তার বাহ্যিক অবস্থার উপর বিচার করা হবে এবং অন্তরের বিষয় আল্লাহর কাছে ন্যস্ত থাকবে।[৬৪]

- **ধর্মনিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা**

মাজালিম আদালতের ধরন কেমন ছিল—এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে কিছু গবেষক[৬৫] একে এক ধরনের "সেমি-সেকুলার" বা আধা-ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামোর মধ্যে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। যদিও প্রাথমিক উৎসসমূহে এ ধরনের কোনো আলোচনাই পাওয়া যায় না।

প্রফেসর নেইলসন তাঁর একাধিক গবেষণায় তিনি মাজালিম আদালতকে কখনো 'অ-ধর্মীয় বা জাগতিক কর্তৃপক্ষ' (temporal authorities) আবার কখনো *secular royal*

63. al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 5:163, Hadith No. 4351. (إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ عن قُلُوبِ النَّاسِ وَلَا أَشُقَّ بُطُونَهُمْ)

64. Ibn Ḥajar, *Fatḥ al-Bārī*, 12:273. (وكلهم أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهر والله يتولى السرائر)

65. যেমন : যোসেফ শাখত (Joseph Schacht), নিমরদ হুরভিৎস (Nimrod Hurvitz) ও অন্যান্য।

jurisdiction হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৬৬] প্রফেসর জ্যাকসন এ ব্যাপারে নেইলসনের সাথে দ্বিমত করে বলেন, মাজালিম আদালতের কার্যপ্রণালী মূলত 'সিয়াসাহ'র সঙ্গে তুলনীয়, এর প্রকৃতিতে শরিয়ার অতিরিক্ত (extra-shar'ī) কিছু উপাদান থাকলেও, এটি আধুনিক পশ্চিমা অর্থে ধর্মনিরপেক্ষ বা সেক্যুলার ছিল না। বরং এটি ইসলামী আইনেরই একটি অংশ।[৬৭] এক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, তাঁরা এরকম চিন্তা কেন করতে গেলেন ? সম্ভাবনা আছে, আল-মাকরিযির একটি বর্ণনা এ ক্ষেত্রে কিছুটা প্রভাব রাখতে পারে। আল-মাকরিযি মঙ্গোলদের 'ইয়াসা' (yasa)-এর অনেক নিয়মকানুন বর্ণনা করেছেন, যেগুলোর কিছু শরিয়তের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক।

'ইয়াসা' ছিল চেঙ্গিস খানের প্রণীত একটি আইনকানুন বিষয়ক গ্রন্থ। 'আইন জালুত' এর যুদ্ধে বহু মঙ্গোল সৈন্যকে বন্দি করে মিসরে আনা হলে প্রথমবার এটি মিসরে প্রবেশ করে। মাকরিযির বর্ণনামতে, কালক্রমে মামলুকদের আইনি ব্যবস্থায় 'ইয়াসা'র প্রভাব দেখা যায়।[৬৮]

কিন্তু এ বিষয়টি দালিলিক প্রমাণ হিসেবে এতটাই ভঙ্গুর যে, স্বয়ং নেইলসনও এর সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি ডেভিড আইলন এর বরাতে বলেন, আল-মাকরিযি নিজে কখনো ইয়াসার কোনো কপি দেখেননি এবং যাকে তিনি তথ্যদাতা বলেছেন, সেই ব্যক্তিও মঙ্গোল ভাষা বা উইঘুর লিপি জানতেন না। তাছাড়া ইয়াসার অস্তিত্বের কোনো প্রমাণ অন্য কোনো ভাষা বা লিপিতেও পাওয়া যায়নি।[৬৯]

এটা হতে পারে যে, এই ব্যাখ্যার পেছনে প্রত্যক্ষ ও দালিলিক প্রমাণের চেয়ে পরোক্ষ কিছু অনুমান অধিক ক্রিয়াশীল ছিল। যেমন:

এক. পশ্চিমা অন্টোলজিকাল পটভূমি

পশ্চিমা জ্ঞানতাত্ত্বিক ও অন্টোলজিকাল ঐতিহ্যে ন্যায়বিচারকে প্রাথমিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষ ধারণা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করার প্রবণতা সুস্পষ্ট। সেখানে প্রায়ই অনুমান করা হয় যে, ধর্মীয় কাঠামোর ভেতর থেকে প্রকৃত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। এই তাত্ত্বিক অবস্থান থেকেই কিছু গবেষক (সকলেই নয়) মাজালিম আদালতকে ইসলামী শরিয়া-ভিত্তিক বিচারব্যবস্থার পরিবর্তে একটি সেকুলার বা অ-ধর্মীয় প্রশাসনিক কাঠামো হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন।

কিন্তু এই আধুনিক ধারণা বা বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেণিবিন্যাসকে মধ্যযুগীয় ইসলামী বাস্তবতার ওপর চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা (anachronism) ইতিহাসচর্চায় একটি পরিচিত ত্রুটি। এর ফলে ইতিহাসের প্রকৃত রূপের বদলে এক ধরনের বিকৃত চিত্র তৈরি হয়।

66. J. S. Nielsen, "Maẓālim," in *The Encyclopaedia of Islam*, vol. 6, ed. C. E. Bosworth, E. van Donzel, W. P. Heinrichs, and Ch. Pellat (Leiden: E. J. Brill, 1991), 933; and Nielsen, "Mazālim and Dār al-ʿAdl under the Early Mamluks," 114.

67. Sherman A. Jackson, *The Islamic Secular* (Oxford University Press, 2024), 184.

68. al-Maqrīzī, *al-Mawāʿiẓ wa'l-Iʿtibār bi-Dhikr al-Khiṭaṭ wa'l-Āthār,* 3:384-86.

69. Nielsen, "Mazālim and Dār al-ʿAdl under the Early Mamluks," 125.

দুই. টেক্সটবুক-নির্ভরতার পূর্বধারণা

বিচারকার্য বা ন্যায়বিচারের প্রতিটি ধাপ অবশ্যই প্রথাগত টেক্সটবুকের বিধিবিধান অনুসারে হতে হবে–এমন একটি কঠোর ধারণা অনেকের চিন্তায় বিদ্যমান। মাজালিম আদালত যেহেতু মাঝে মাঝে প্রচলিত বিধি-নিষেধের বাইরে নমনীয় পদ্ধতি গ্রহণ করত, ফলে সেটিকে “শরিয়া-বহির্ভূত” মনে করা হয়েছে। আর শরিয়া-বহির্ভূতকে সরাসরি ‘সেকুলার’ হিসেবে অভিহিত করা–এই ব্যাখ্যার আরেকটি অন্তর্নিহিত বিচ্যুতি। এই ধারণাটি কেবল অমুসলিম গবেষকদের মধ্যেই নয়, প্রাক-আধুনিক কিছু মুসলিম আলেমদের মধ্যেও অনুরূপ ধারণা বিদ্যমান ছিল।

উদাহরণস্বরূপ, পঞ্চম হিজরি শতকের হাম্বলি ফকিহ ইবনু আকিল (৪০১-৪৯৩ হি.) এবং তাঁর সমসাময়িক কিছু আলেমদের মাঝে একটি মাসআলা নিয়ে মতবিরোধ হয়েছিল। সেই আলেমগণ মনে করতেন যে, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সকল ক্ষেত্রেই শরিয়তের দলীল থাকা লাগবে, শরিয়তে যা আছে তা ছাড়া কোন ‘সিয়াসাত’ নেই (لا سياسة إلا ما وافق الشرع)। ইমাম ইবনু আকীল রহ. এর বিরোধিতা করে বলেন, শরিয়ত প্রণেতা (আল্লাহ ও তাঁর রাসুল) নিষেধ করেননি এমন যে কোনো পদ্ধতি যা ন্যায়পরায়ণতা নিশ্চিত করে, তা শরিয়তসম্মত। যদিও এ ব্যাপারে কোন স্পষ্ট দলীল নাও থাকে।

নবম শতকের বিখ্যাত ধর্মতাত্ত্বিক ইবনুল কায়্যিম (মৃ. ৭৫১ হি.) এই বিতর্কের কথা উল্লেখ করে ইবনু আকিলের মতামতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।[৭০] ইবনুল কায়্যিম রহ. আরো বলেন, আল্লাহ তাআলা নবী-রাসূল ও আসমানী গ্রন্থ এই উদ্দেশ্যেই পাঠিয়েছেন যেন, মানবসমাজ ন্যায়বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ন্যায়বিচারই আসমান ও জমিনের অস্তিত্ব ও ভারসাম্যের মৌলিক ভিত্তি। অতএব, যখনই সত্যের লক্ষণ প্রকাশিত হয়, যুক্তি-প্রমাণ তার সমর্থনে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যেকোনো পন্থায় সত্য সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়– সেখানেই আল্লাহর শরিয়া, তাঁর দীন, তাঁর সন্তুষ্টি ও আদেশ প্রতিফলিত হয়।[৭১]

আধুনিক সময়ে ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহ.-কে ইসলামী অর্থোডক্সির একজন অন্যতম প্রতিভূ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ন্যায়বিচার বাস্তবায়নের ব্যাপারে তাঁর উপরিউক্ত দৃষ্টিভঙ্গির মাঝে আধুনিক সময়ের বিভিন্ন ঘরণার মুসলিম চিন্তাবিদদের জন্য চিন্তার খোরাক রয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে কোনো ন্যায়বিচারই শরিয়তের বাইরে নয়। মাজালিম আদালতের প্রধান উদ্দেশ্যই হল, সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে জুলুম প্রতিহত করা তথা ন্যায়বিচার বাস্তবায়ন

70. Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Saʿd Shams al-Dīn ibn Qayyim al-Jawziyya, *Iʿlām al-Muwaqqiʿīn ʿan Rabb al-ʿĀlamīn*, ed. Muḥammad ʿAbd al-Salām Ibrāhīm (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah,1991), 4: 283

71. Ibn Qayyim al-Jawziyya, *Iʿlām al-Muwaqqiʿīn ʿan Rabb al-ʿĀlamīn*, 4:241.

করা। সুতরাং বাহ্যিকভাবে এর কিছু বিষয় শরিয়ার অতিরিক্ত মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা শরিয়ার বৃহত্তর গণ্ডির মধ্যেই থাকে।

মাজালিম আদালত: আধুনিক সময়ে এর প্রয়োজনীয়তা

মাজালিম আদালতের প্রয়োজনীয়তা আসলে কী? আধুনিক সময়ে কেন-ই বা এধরনের প্রতিষ্ঠানের দরকার? মাজালিম আদালত থাকলেই কী জুলম-নির্যাতন সব বন্ধ হয়ে যাবে? সন্দেহ নেই, উপরিউক্ত জিজ্ঞাসাগুলো একজন সচেতন ব্যক্তির চিন্তাজগতে অবশ্যই আলোড়ন তুলবে।

ইতিহাসের আলোকে আমরা দেখি যে, মুসলিম শাসনব্যবস্থায় মাজালিম আদালতকে একটি বিশেষায়িত বিচার কাঠামো হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এর বিচারিক পরিধি মূলত জাগতিক লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়াবলি এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের ফলে সৃষ্ট অন্যায়-অত্যাচারের মোকাবিলা কেন্দ্র করে আবর্তিত ছিল। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল–সমাজে শক্তিশালী ও প্রভাবশালী ব্যক্তির বিরুদ্ধে নিপীড়িত সাধারণ মানুষকে সুবিচার নিশ্চিত করার একটি বিকল্প ও কার্যকরী ব্যবস্থা। অবশ্যই মাজালিম আদালতের সীমাবদ্ধতা ছিল, এটা ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত- এমন দাবী করার সুযোগ নেই। কিন্তু এর সকল সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বলা যায়, এই আদালত সমাজের জন্য একটি নিরাপত্তা বলয় (safety net) হিসেবে কাজ করতে পারে, যেখানে অপরাধীর সামাজিক মর্যাদা বা রাজনৈতিক অবস্থান বিচারপ্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে না। এর মাধ্যমে জনগণের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হবে যে, অন্যায় করে কেউ পার পেয়ে যেতে পারে না– যে-ই হোক না কেন। এটি অবশ্যই সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পথে এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার নামান্তর।

আধুনিক বিশ্বব্যবস্থায় রাষ্ট্র পরিচালনার প্রধান নীতিমালায় বিদ্যমান লিবারেল ডেমোক্রেসির প্রভাবের পরিপ্রেক্ষিতে অধিকাংশ দেশের সংবিধানে ক্ষমতার বিভাজন নীতি গ্রহণ করা হয়েছে; ফলত সেখানে এমন এক স্বাধীন ও শক্তিশালী বিচারব্যবস্থার বিকাশ ঘটেছে, যা রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অন্যান্য শাখা থেকে স্বতন্ত্রভাবে পরিচালিত হয়। এর ফলশ্রুতিতে সর্বোচ্চ আদালত বিচার বিভাগের কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বে পরিণত হয়েছে এবং অন্যান্য সব ট্রাইব্যুনাল তার অধীনস্থ হয়ে পড়েছে। একারণে কেউ কেউ মনে করেন, সর্বোচ্চ আদালত কার্যত সেই ধরনের ক্ষমতা অর্জন করেছে, যা অতীতে মাজালিম আদালতের হাতে ছিল।[৭২] তবে এর অর্থ এই নয় যে, আধুনিক কাঠামোয় সরকারকে জবাবদিহির আওতায় আনতে মাজালিম আদালতের আর কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ বাস্তবতা হল, অনেক মুসলিম দেশে সংবিধান ও আইন থাকলেও বাস্তব প্রয়োগে জবাবদিহিতা ও আইনের শাসনের ঘাটতি দেখা যায়। কেবলমাত্র শক্তিশালী সর্বোচ্চ আদালত থাকলেই এই ঘাটতি পূরণ হয় না, কারণ সাধারণ আদালত প্রায়শই প্রশাসনিক অনিয়ম বা ক্ষমতার অপব্যবহারের মামলাগুলো দ্রুত ও কার্যকরভাবে নিষ্পত্তি করতে পারে না।

72. Mohammad Hasim Kamali, *Citizenship and Accountability of Government : An Islamic perspective* (Cambridge: The Islamic Text Society, 2011), 272.

মাজালিম আদালতকে যদি একটি বিশেষায়িত প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল হিসেবে পুনরুজ্জীবিত করা যায়, তবে এটি সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের অভিযোগ ও প্রশাসনিক গাফিলতি মোকাবেলায় কার্যকর হতে পারে–যা সাধারণ আদালতের কাজের ক্ষেত্রের বাইরে।

মাজালিম আদালত গঠনে বিবেচ্য বিষয়

মাজালিম আদালত ও ন্যায়পাল ব্যবস্থা কাছাকাছি হলেও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে 'মাজালিম আদালত'-এর তুলনায় 'ন্যায়পাল' শব্দটি বেশি প্রসিদ্ধ। যদিও উভয়ের মধ্যকার পার্থক্য পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে ন্যায়পাল আইন পাস হয় ১৯৮০ সালে। সংবিধানের ৭৭ নং অনুচ্ছেদে ন্যায়পাল নিয়োগের কথা বর্ণিত আছে। তবে বাংলাদেশের ইতিহাসে কখনো ন্যায়পাল নিয়োগ করা হয়নি। বর্তমানে বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতায় মাজালিম আদালত বা ন্যায়পাল থেকে উপকৃত হতে হলে শুধু তা গঠন করাই যথেষ্ট নয়; বরং এর প্রায়োগিক কার্যকারিতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করতে নিম্নোক্ত দিকগুলো সতর্কতার সাথে বিবেচনায় নেওয়া জরুরি–

- **নিয়োগ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা**

নিয়োগ প্রক্রিয়া অবশ্যই রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হতে হবে। দক্ষতা ও নৈতিক মানদণ্ডের ভিত্তিতে বিচারক বা কর্মকর্তাদের নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান কার্যকর হতে হলে এটিকে শুধু সাংবিধানিক ক্ষমতা দিলেই হবে না; বরং স্বাধীনতা, স্বচ্ছতা ও রাজনৈতিক চাপ থেকে মুক্ত রাখার নিশ্চয়তা দিতে হবে। নাহলে এটি কাগজে-কলমে থাকলেও বাস্তবে তেমন প্রভাব ফেলবে না।

- **মামলা নিষ্পত্তিতে দ্রুততা ও স্বচ্ছতা**

অযথা বিলম্ব এড়িয়ে মামলার নিষ্পত্তি দ্রুত করতে হবে। বিচারিক প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা বজায় রেখে জনগণের আস্থা অর্জন জরুরি।

- **বাস্তবায়ন ক্ষমতা ও প্রশাসনিক সহায়তা**

শুধুমাত্র অভিযোগ দাখিল করাকেই বিচার পাওয়ার সমার্থক হিসেবে বিবেচনা না করে, অভিযোগের পূর্ণাঙ্গ তদন্ত ও যথাযথ নিষ্পত্তিই হওয়া উচিত এই বিচারব্যবস্থার মূল লক্ষ্য। আদালতের সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য প্রশাসনিক সহায়তা ও যথাযথ আইনগত ক্ষমতা থাকতে হবে। বাস্তবায়ন ব্যবস্থার দুর্বলতা বিচারব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করতে পারে।

- **সহজলভ্যতা**

মুসলিম শাসন ব্যবস্থার ইতিহাসে দেখা যায়, মাজালিম আদালত জনগণের জন্য সহজলভ্য ছিল। এজন্য এমন একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন, যেখানে সহজ ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় সাধারণ নাগরিকেরা তাদের অভিযোগ উত্থাপন

করতে পারে এবং তা কার্যকরভাবে নিষ্পত্তির পর্যায়ে পৌঁছায়। এক্ষেত্রে অভিযোগকারীকে সতর্ক থাকতে হবে যাতে তার উত্থাপিত অভিযোগটি সাধারণ বিচার ব্যবস্থার আওতাধীন কোনো বিষয় নয় বরং মাজালিম আদালতের বিচারিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী উপযুক্ত হয়। কেননা, এটি প্রচলিত বিচারব্যবস্থার বাইরে একটি অতিরিক্ত ও বিশেষায়িত প্রশাসনিক বিচারব্যবস্থা, যার স্বকীয়তা ও গুরুত্ব রক্ষা করা অপরিহার্য।

- **বিচারিক কর্তৃত্বসীমা নির্ধারণ**

সাধারণ বিচারব্যবস্থা ও মাজালিম আদালতের মধ্যে স্পষ্ট বিচারিক কর্তৃত্বসীমা নির্ধারণ করা জরুরি। যদি মাজালিম আদালতকে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়, তবে এর মূল দায়িত্ব হবে সরকারি অনিয়ম এবং জনগণের পক্ষ থেকে সরকারের প্রভাবশালী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ-সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করা।

আল-মাওয়ার্দি মাজালিম আদালতের দশ ধরনের বিচারিক ক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলো নিম্নরূপঃ

- শাসক বা রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে প্রজাদের প্রতি ক্ষমতার অপব্যবহার সংক্রান্ত অভিযোগের নিষ্পত্তি।
- কর আদায়ের প্রক্রিয়ায় এজেন্ট বা প্রতিনিধিদের অতিরিক্ত আদায়, চাঁদাবাজি কিংবা জুলুম নিরসন।
- প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নিবন্ধন ও তাদের কার্যক্রমের বৈধতা পর্যবেক্ষণ।
- রাষ্ট্রীয় সুবিধাভোগীদের ক্ষেত্রে ঘাটতি, বিলম্ব বা অবহেলার অভিযোগ যাচাই ও নিষ্পত্তি।
- জবরদখল বা জোরপূর্বক দখল করা সম্পত্তিকে প্রকৃত মালিকের মালিকানা পুনঃপ্রতিষ্ঠা।
- ওয়াকফ প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধান ও এর সুষ্ঠু পরিচালনা নিশ্চিতকরণ।
- উচ্চতর ও অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন আদালতের অনিষ্পন্ন রায় এর সমাধান প্রদান, যেখানে সাধারণ আদালতের এখতিয়ার সীমাবদ্ধ।
- এমন সব অন্যায় প্রতিরোধ করা যা মুহতাসিব (হিসবাহ বিভাগের তদারককারী) নিজ ক্ষমতায় প্রতিরোধ করতে অক্ষম।
- জনগণের ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের মর্যাদা রক্ষা ও সুরক্ষা প্রদান।
- বিবদমান পক্ষসমূহের মধ্যে সালিসি এবং বাদী-বিবাদীর মধ্যে ন্যায়সঙ্গত রায় প্রদান।[৭৩]

ইমাম আল-মাওয়ার্দির উল্লিখিত সীমারেখা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। বিচারিক অধিক্ষেত্র সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ না করলে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও প্রশাসনিক জটিলতা সৃষ্টি

[73]. al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, 107-11.

হতে পারে। স্পষ্ট সীমারেখা নির্ধারণ বিচারব্যবস্থার শৃঙ্খলা, কার্যকারিতা এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অধিক ফলপ্রসূ।

শেষ কথা

হাজার বছরের মুসলিম শাসনব্যবস্থার বিচারিক ঐতিহ্যে মাজালিম আদালত আসলে কেমন ছিল–এই প্রশ্নের উত্তর মোটেও সহজ ও একরৈখিক নয়। একটি প্রবন্ধের সীমাবদ্ধ পরিসরে এর পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ সম্ভব নয়, কারণ কালের বিবর্তনে ও অঞ্চলভেদে এর ধরন ও কাঠামো ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে।[৭৪] ফলে প্রশ্নটি একমাত্রিক হলেও এর উত্তর বহুমাত্রিক। তবুও কিছু মূল দিক তুলে ধরা যায়।

মাজালিম শব্দের অর্থ হলো জুলুম, অভিযোগ বা অন্যায়। শাসকের দায়িত্ব হল মানুষের মাঝে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা। ইতিহাসবিদদের মতে, মাজালিম আদালতের প্রাতিষ্ঠানিক উদ্ভব উমাইয়া যুগের শেষদিকে হয়েছে। তবে এ সংক্রান্ত আলোচনা যা পাওয়া যায়, তা সবই আব্বাসি শাসনামলে আমলে রচিত। ফলে উমাইয়াদের সময়ে মাজালিম আদালত আসলেই কেমন ছিল- তা নিয়ে কিছুটা পক্ষপাতিত্ব থাকতে পারে। আব্বাসিয় খলিফাদের অধীনে এটি একটি আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে ওঠে। তাঁরা নিজেরা যেমন এটি পরিচালনা করেছেন তেমনি প্রতিনিধিও নিয়োগ দিয়েছিলেন। মিসরের মামলুক শাসকগণ এই আদালতকে খুবই গুরুত্বের সাথে নিয়েছিলেন এবং তাঁদের সময়ে এই আদালত অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে পরিচালনা হতো। মামলুক সুলতানরা যখন জনগণের অভিযোগ শুনতেন, সেই স্থানকে 'দারুল আদল' বা 'ইওয়ান' নামে অভিহিত করা হতো।

পরিচালনার দিক থেকে দেখা যায়, শাসক নিজেই জনগণের অভিযোগ সরাসরি শুনে ন্যায়বিচার প্রদানের দায়িত্ব পালন করতেন। নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আদালত বসত এবং এর দায়িত্ব পালন করতেন মন্ত্রী, কাযি বা কোনো উচ্চপদস্থ আমলা। ফিকহি ও প্রশাসনিক শুদ্ধতা রক্ষার জন্য উলামা ও মুফতিরা উপস্থিত থাকতেন। আদালতের

[74]. অবিভক্ত পূর্ব পাকিস্তানের একজন সরকারি আমলা নিজ স্মৃতি কথায় লিখেছেন যে, প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের নিজের দস্তখত করা একটি অতি গোপনীয় সার্কুলার ছিল। তাতে বলা হয়েছিল গভর্নর, মন্ত্রী, সংসদ সদস্য বা তাঁদের পরিবারের কেউ যদি কমিশনার, ডিসি বা তাঁদের অধীনস্ত কর্মচারীদের কাজে অন্যায়ভাবে বাধা দেয় বা কোন অন্যায় অনুরোধ করেন তা হলে ঐ অফিসাররা সরাসরি প্রেসিডেন্টের কাছে ডেমি অফিসিয়াল লেটার লিখতে পারবেন। চিঠির একটা কপি প্রাদেশিক চিফ সেক্রেটারীকেও দিতে হবে। দেখুন: P A Nazir, *Smritir Pata Theke* (Dhaka: Natun Safar Prakashani, 1993), 181. [উনার এই কথাকে যদি আমরা আপাতদৃষ্টিতে সত্য *(prima facie)* ধরে নিই, তাহলে বুঝতে পারব যে, হুবহু টেক্সটবুক উদাহরণ না হলেও এখানে মাজালিম আদালতেরই একটি ভিন্নরূপ প্রকাশ পেয়েছে। বাস্তবতা এটাই যে, মুসলিম বিচারিক ব্যবস্থার ইতিহাসে মাজালিম আদালতের উপর স্থানীয় সংস্কৃতির প্রভাব বেশ গভীর ছিল।]

রায় কার্যকর করতে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যও সেখানে থাকত।

মাজালিম আদালতের কার্যাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল প্রাদেশিক গভর্নর ও আমলাদের অন্যায়-অত্যাচারের বিচার, সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে জনগণের অভিযোগের শুনানি, কর আদায়ে অতিরিক্ত চাপ প্রতিরোধ, সরকারি রেকর্ডে জালিয়াতি বা অপব্যবহার রোধ, এবং জনগণের ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে প্রতিবন্ধকতা দূর করা। তবে এর সীমাবদ্ধতাও ছিল। ইতিহাস থেকে বোঝা যায়, এই আদালতের কার্যকারিতা অনেকাংশেই নির্ভর করত শাসকের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর। ফলে একদিকে এটি জনগণের ন্যায়বিচারের আশ্রয়স্থল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেও, অন্যদিকে শাসকের মনোভাবের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় এর কার্যকরিতা সব সময় সমান ছিল না।

তবে ইতিহাস প্রমাণ করে, মাজালিম আদালত মুসলিম শাসন ব্যবস্থায় জনগণের জন্য অনেকক্ষেত্রেই কার্যকর ন্যায়বিচারের মাধ্যম ছিল। আধুনিক মুসলিম রাষ্ট্রে এর একটি স্বাধীন ও সাংবিধানিক সংস্করণ চালু করা হলে জবাবদিহিতা ও আইনের শাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এটি শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রশাসনিক জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ এবং ন্যায়বিচারের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে মাজালিম আদালতের ঐতিহাসিক মডেল গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। সেই সাথে আশা করা যায়, এই গবেষণা সমসাময়িক আইনি ও প্রশাসনিক সংস্কার আলোচনায় ইসলামী আইন ও রাজনীতি শাস্ত্রের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে কাজে লাগানোর নতুন সম্ভাবনা উন্মোচন করবে এবং ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সমন্বয়ে একটি কার্যকর বিচার ব্যবস্থা গড়ে তোলার পথ দেখাবে।[**]

** প্রবন্ধের শেষে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি গবেষণারত বাল্যবন্ধু 'ত্বহা তরীক' কে। বিভিন্নভাবে তাঁর মূল্যবান পরামর্শ আমাকে এবং আমার এই প্রবন্ধকে সমৃদ্ধ করেছে। মহান আল্লাহ তাঁর জীবনকে বরকতময় করুন। هل جزاء الإحسان إلا الإحسان

Bibliography

al-Qurʾān al-Karīm

Abdun Noor. *Lok Proshashon: Shangatan, Procria abong Anuchintha.* Dhaka: Bangladesh Institute of Islamic Thought, 2009.

Abū Yūsuf, Qāḍī Yaʿqūb ibn Ibrāhīm. *Kitāb al-Kharāj.* Beirut: Dār al-Maʿrifah, 1979.

al-ʿAskarī, Abū Hilāl al-Ḥasan ibn ʿAbd Allāh ibn Sahl ibn Saʿīd ibn Yaḥyā ibn Mihrān. *al-Awāʾil,* ed. Muḥammad al-Sayyid al-Wakīl. Ṭanṭā: Dār al-Bashīr, 1408 H.

al-Baihaqī, Ibrāhīm ibn Muḥammad. *al-maḥāsin wal-masāwī*. Beirut: Dār Ṣādir.

al-Bukhārī, Abū ʿAbd Allāh Muḥammad ibn Ismāʿīl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī.* Edited by Muḥammad Zuhayr ibn Nāṣir al-Nāṣir. Beirut: Dār Ṭawq al-Najāḥ, 1422 H.

al-Jawzī, Jamāl al-Dīn Abū al-Faraj ʿAbd al-Raḥmān ibn ʿAlī ibn Muḥammad. *al-Muntaẓam fī Tārīkh al-Umam wa-al-Mulūk*. Ed. Muḥammad ʿAbd al-Qādir ʿAṭā and Muṣṭafā ʿAbd al-Qādir ʿAṭā. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1992.

al-Kattānī, Muḥammad ʿAbd al-Ḥayy ibn ʿAbd al-Kabīr ibn Muḥammad al-Ḥusnī al-Idrīsī. *al-Tarātīb al-Idārīyah*, ed. ʿAbd Allāh al-Khāldī. Beirūt: Dār al-Arqām,1963.

al-Maqrīzī, Taqī al-Dīn Abū al-ʿAbbās Aḥmad ibn ʿAlī ibn ʿAbd al-Qādir. *al-Mawāʿiẓ wa'l-Iʿtibār bi-Dhikr al-Khiṭaṭ wa'l-Āthār.* Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1418 H.

— — —. *al-Sulūk li Maʻrifat Duwal al-Mulūk,* Edited by Muḥammad ʻAbd al-Qādir ʻAṭā. Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah, 1997.

al-Māwardī, Abū al-Ḥasan ʿAlī ibn Muḥammad. *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah.* Edited by Aḥmad al-Baghdādī. Kuwait: Maktabah Dār Ibn Qutaibah, 1989.

al-Naysābūrī, Abū al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī. *Ṣaḥīḥ Muslm.* Edited by Muḥammad Fuwād ʻAbd al-Bāqī. Beirut: Dār Iḥyā al-Turāth al-ʻArabī, Nd.

al-Nuwairī, Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn ʿAbd al-Wahhāb ibn Muḥammad. *Nihāyat al-Arab fī Funūn al-Adab.* Cairo: Dār al-Kutub, 1423 H.

al-Shaizarī, Zalāl al-Dīn ʻAbd al-Raḥmān ibn Naṣr ibn ʻAbd Allāh . *al-Manhaj al-Maslūk fī Siyāsat al-Mulūk*, Edited by ʻAlī ʻAbd Allāh al-Mūsā. Jordan: Maktabat al-Manār, 1987.

al-Ṭabarī, Abū Jaʻfar Muḥammad ibn Jarīr ibn Yazīd ibn Kathīr ibn Ghalib al-Āmlī. *Tārīkh al-Rusul wa al-Mulūk*. 2nd ed. Bayrūt: Dār al-Turāth, 1387 H.

al-Zuḥaylī, Wahbah ibn Muṣṭafā. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Damascus: Dār al-Fikr.

Firoj, Jalal. *Parliamentary Shabdakosh.* Dhaka: Bangla Academy, 2016.

Fuess, A. "Ẓulm by Maẓālim? The Political Implications of the Use of Maẓālim." *Mamlūk Studies Review* 13, no. 1 (2009): 121–147. https://doi.org/10.6082/JKWP-DH05

Hajdari, Enika. "Ombudsman – Historical Views." *European Scientific Journal*, Special ed., vol. 1 (February 2014): 515–27.

Hallaq, Wael B. *The Origins and Evolution of Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

Ḥamdī ʿAbd al-Munʿim. *Dīwān al-Maẓālim: Nashʾatuh wa-Taṭawwuruh wa-Ikhtiṣāṣuh Muqāranan bi-al-Niẓām al-Qaḍāʾiyyah al-Ḥadīthiyyah.* Beirut: Dār al-Shurūq, 1983.

Han Woo-Keun. *The History of Korea.* Translated by Lee Kyung-Shik. Honolulu: East-West Center Press, 1970.

Ibn al-ʿArabī, Abū Bakr Muḥammad ibn ʿAbd Allāh. *Aḥkām al-Qurʾān*. Edited by Muḥammad ʿAbd al-Qādir ʿAṭā. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2003.

Ibn ʿAsākir, Abū al-Qāsim ʿAlī ibn al-Ḥasan ibn Hibat Allāh. *Tārīkh Dimashq*. Edited by ʿAmr ibn Gharāmah al-ʿUmrawī. Beirut: Dār al-Fikr, 1995.

Ibn Faḍl Allāh al-ʿUmarī, Aḥmad ibn Yaḥyā. *Masālik al-abṣār fī mamālik al-amṣār*. 1st ed. Abu Dhabi: al-Majmaʿ al-Thaqāfī, 2002.

Ibn Ḥajar, Abū al-Faḍl Aḥmad b ʻAlī ibn Ḥajar al-ʻAsqalānī. *Fatḥ al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Edited by: Muḥammad Fuwād ʻAbd al-Bāqī. Beirut: Dār al-Maʻrifah. 1379H.

Ibn Kathīr, Abū al-Fidāʾ Ismāʿīl ibn ʿUmar. *al-Bidāyah wa-al-Nihāyah*. Edited by ʿAlī Shīrī. Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī, 1988.

Ibn Khaldūn, Walī al-Dīn ʻAbd al-Raḥmān ibn Muḥammad. *Muqaddimah Ibn Khaldūn* Edited by ʻAbd Allāh Muḥammad al-Darwīsh. Damascus: Dār Yaʻrab, 2004.

Ibn Qayyim al-Jawziyya, Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Saʿd Shams al-Dīn. *Iʿlām al-Muwaqqiʿīn ʿan Rabb al-ʿĀlamīn*. Edited by Muḥammad ʿAbd al-Salām Ibrāhīm. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1991.

Ibn Saʻad, Abū ʻAbd Allāh Muḥammad. *al-Ṭabaqāt al-Kubrā*. Edited by Muḥammad ʻAbd al-Qādir ʻAṭā. Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah, 1990.

Jackson, Sherman A. *The Islamic Secular*. Oxford University Press, 2024.

Kamali, Mohammad Hashim. *Citizenship and Accountability of Government: An Islamic Perspective.* Cambridge: The Islamic Text Society, 2011.

Karmī, Ḥāfiẓ Aḥmad ʻAjjāj. *al-Idārah fī ʻAṣr al-Rasūl*. Cairo: Dār al-Salām, 1427 H.

Kracke, Edward A., Jr. "Early Visions of Justice for the Humble in East and West." *Journal of the American Oriental Society* 96, no. 4 (October–December 1976): 492.

Muṣṭafā, Yaḥyā Muṣṭafā. *Wilāyat al-Maẓālim: Dirāsah Muqāranah.* Master's thesis, Jāmiʿat al-Imām Muḥammad ibn Suʿūd al-Islāmiyyah, Riyadh, Saudi Arabia. Supervised by Dr. ʿAbd al-Fattāḥ Muṣṭafā al-Ṣayfī, Nd.

Nielsen, Jørgen S. "Mazālim and Dār al-ʿAdl under the Early Mamluks." *The Muslim World* 66, no. 2 (1976): 114–32. https://doi.org/10.1111/j.1478-1913.1976.tb03191.x

— — —. "Maẓālim." In *The Encyclopaedia of Islam*, vol. 6, edited by C. E. Bosworth, E. van Donzel, W. P. Heinrichs, and Ch. Pellat, 933. Leiden: E. J. Brill, 1991.

Rabbat, Nasser O. "The Ideological Significance of the Dār al-Adl in the Medieval Islamic Orient." *International Journal of Middle East Studies* 27, no. 1 (February 1995): 3–28.

Rahmani, Ziaullah. "Wilayat Al Mazalim: Application of Siysah Shari'yyah Meaning of Wilayat Al Mauzalim." *Al-Idah* 25, no. 2 (2012): 1–22.

Tillier, Mathieu. "The Mazalim in Historiography." In *The Oxford Handbook of Islamic Law*, edited by Anver M. Emon and Rumee Ahmed, 357–380. Oxford: Oxford University Press, 2018.

Zakaria, Abu Baker Muhammad, and Al Amin. *Islame Tort Aien.* Dhaka: Islamic Foundation, 2023.